মাসিক
পৃথিবী
ইসলামী গবেষণা পত্রিকা

আগস্ট ২০২৪
শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪৩১
মুহাররম-সফর ১৪৪৬
বর্ষ ৪৩ ॥ সংখ্যা ১১

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ॥
শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থান ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখুন ॥ ৩
দারসুল কোরআন
আল্লাহ ও রাসূলের আহ্বানে সাড়া দেয়ার সুফল
প্রফেসর শাইখ ড. মুহাম্মাদ আব্দুস সামাদ ॥ ৫
দারসুল হাদীস
সৃষ্টির প্রতি সদয় আচরণ : ইসলামী সংস্কৃতির অন্যতম অনুষঙ্গ
অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ ছাইদুল হক ॥ ১৫
জীবনকথা ॥
আসহাবে রাসূলের জীবন কথা
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ ॥ ২৫
চিন্তাধারা
আল্ কুরআন সম্পর্কে কতিপয় জরুরী জ্ঞাতব্য বিষয়
ড. মোঃ ছামিউল হক ফারুকী ॥ ৩৫
অনুপম সুন্দর মহামানব মুহাম্মাদ (সা) এর
প্রাঞ্জল ভাষা প্রয়োগ ও আচরণ-সৌন্দর্য
প্রফেসর আর. কে. শাব্বীর আহমদ ॥ ৪৮
প্রশ্নোত্তর ॥ ৫৬

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫-এর পক্ষে ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী কর্তৃক প্রকাশিত এবং আলফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, ৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭ থেকে মুদ্রিত।

যোগাযোগ :

সম্পাদকীয় বিভাগ : ২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড (৪র্থ তলা), ঢাকা-১২০৫
সেলস্ এন্ড সার্কুলেশান : কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০; ফোন : ০১৫৭৫৬২২০৮৫, ০১৬১২৯৫৩৬৭০, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
৩৪/১ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ফোন : ০১৭৪১৬৭৭৩৯৯
Web : www.dhakabic.com, E-mail : dhakabic@gmail.com

ISSN : 1815-3925

মূল্য : পঞ্চাশ টাকা

মাসিক পৃথিবী'র নিয়মাবলী

১. এজেন্সী

- ✳ প্রতি কপি পত্রিকার গায়ের মূল্য ৫০ টাকা।
- ✳ সর্বনিম্ন পাঁচ কপির এজেন্সী দেয়া হয়।
- ✳ এজেন্সীর জন্য অগ্রিম বা জামানত পাঠাতে হয়।
- ✳ অর্ডার পেলেই পত্রিকা ডাক ও কুরিয়ার যোগে পাঠানো হয়।
- ✳ যে কোন মাস থেকে পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়।
- ✳ অবিক্রিত কপি ফেরত নেয়া হয় না।
- ✳ ৫ কপি থেকে ২৫ কপির জন্য ২৫% কমিশন দেয়া হয়।
- ✳ ২৬ কপি থেকে ১০০ কপির জন্য ৩০% কমিশন দেয়া হয়।

দেশের নাম	সাধারণ	রেজিঃ
✳ বাংলাদেশ	৭০০/-	৭০০/-
✳ ভারত, নেপাল ও পাকিস্তান	১৩৫০/-	১৬০০/-
✳ মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া	১৬০০/-	১৯০০/-
✳ আফ্রিকা, ইউরোপ	২৬০০/-	২৮০০/-
✳ আমেরিকা, ওশেনিয়া	২৮০০/-	২৯০০/-

৩. গ্রাহক চাঁদা পাঠাবার নিয়ম

- ✳ গ্রাহক হবার জন্য মনি অর্ডার/চেক/ব্যাংক ড্রাফট- 'মেসার্স পৃথিবী' হিসাব নং-১০৮৫, এম.এস.এ (ইসলামী ব্যাংক, এলিফ্যান্ট রোড শাখা)-এর নামে অগ্রিম পাঠাতে হয়।
- ✳ বিকাশ মার্চেন্ট নাম্বারে পেমেন্ট করুন -০১৭৩২৯৫৩৬৭০
- ✳ পত্রিকা বৃদ্ধি করা/কমানো বা পত্রিকার বিল সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে যোগাযোগ করুন : ০১৫৭৫৬২২০৮৫

ম্যানেজার

সেল্‌স এন্ড সার্কুলেশন বিভাগ

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০।

ফোন ঃ ০১৬১২৯৫৩৬৭০, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০

৩৪/১ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০, ফোন: ০১৭৪১৬৭৭৩৯৯

Web: www.dhakabic.com, E-mail : dhakabic@gmail.com

শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থান ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখুন

ধর্মে ধর্মে পার্থক্য একটি স্বাভাবিক বিষয়। এ পার্থক্য মূলত 'আকীদা বিশ্বাসের পার্থক্যের কারণেই হয়ে থাকে। আর 'আকিদা বিশ্বাস এমন এক জিনিষ, যার উপর জবরদস্তি চলে না। বরং এর উপর জবরদস্তি করতে গেলে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। এজন্য ধর্মকে বুঝাতে হয়, উপলব্ধিতে আনতে হয়। কিন্তু চাপিয়ে দেওয়া যায় না। আল্লাহ তা'আলা যেহেতু মানুষকে স্বাধীন স্বত্তা ও স্বাধীন বিবেকবুদ্ধি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং দুনিয়ার জীবনে চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা দিয়েছেন, সেহেতু সকলকে একই ধর্মের অনুসারী হতে বাধ্য করা আল্লাহর ইচ্ছা নয়। আল্লাহ ইচ্ছা করলে সকলকে একই ধর্মের ছায়াতলে সমবেত করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের সকলকে হিদায়াতের উপর ঐক্যবদ্ধ করতে পারতেন।"

আল্লাহ যেহেতু তা করেননি, সেজন্য ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও জবরদস্তিকেও অনুমোদন দেননি। তিনি বলেছেন, "তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না।"

অন্যত্র তিনি বলেন, "দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই।" সুতরাং প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীদেরকে অন্যের ধর্মের প্রতি সহনশীল হতে হবে। সকল ধর্মের অনুসারীদেরকেই অন্যের ধর্ম প্রতিপালনের সুযোগ করে দিতে হবে এবং কোনো ধর্ম প্রতিপালনে বাধার সৃষ্টি করা যাবে না এবং কোনো ধর্মের অবমাননা করা যাবে না। যারা কোনো ধর্ম বা ধর্মপুরুষের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ, কুৎসা রচনা বা অবমাননা করেন, তারা অত্যন্ত অধার্মিক ও কুরুচিপূর্ণ ব্যক্তি। বাক স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে যারা এ কাজগুলো করেন তারা আরো অধিক ঘৃণিত। কেননা একদিকে তারা অন্যায় করছে আবার অন্যদিকে সে অন্যায়কে যৌক্তিক প্রমাণের চেষ্টা করছে।

অন্যের ধর্মের অবমাননা করলে নিজের ধর্মের অবমাননা হয়। কেননা যে ধর্মের অবমাননা করা হবে, তার অনুসারীরাও অবমাননাকারীর ধর্মের অবমাননা করার চেষ্টা করবে। এজন্য আল্লাহ তা'আলা অন্যের ধর্মের অবমাননাকে নিষেধ করেছেন।

ইসলাম অন্য ধর্মের প্রতি যে সহনশীল আচরণের নির্দেশ দেয়, তা প্রত্যেক মুসলিমকে মেনে চলতে হবে। অনুরূপভাবে অন্য ধর্মের অনুসারীদেরকেও ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি একই রকম সহনশীল আচরণ করতে হবে। তাহলেই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় থাকবে। তাহলেই স্ব স্ব ধর্ম প্রতিপালন করেও সকলে একত্রে শান্তিপূর্ণভাবে জীবন যাপন করতে পারবে। কোনো নরপশু পবিত্র ধর্মের

অবমাননা করলে সেজন্য দাঙ্গা-হাঙ্গামা না করে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। আইন হাতে তুলে না নিয়ে আইনশৃংখলা বাহিনীর হাতে সোপর্দ করতে হবে। তবে এ নরপশুদের উপযুক্ত শাস্তির বিধান করে আইনও করতে হবে। রাষ্ট্র কতৃক এধরণের গর্হিত কাজের শাস্তি নিশ্চিত হলে জনগণও আশ্বস্ত হবে এবং শাস্তির ভয়ে এধরণের অপকর্ম করতে কেউ সাহস পাবেনা। তবে সকল অবস্থায় সকলকে ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে শান্তিপূর্ণ অবস্থান নিশ্চিত করতে হবে। আমরা সকল ধর্মের অনুসারীদের প্রতি সে আহ্বানই জানাচ্ছি। ■

নিয়মিত পড়ুন

ইসলামী গবেষণা পত্রিকা

“মাসিক পৃথিবী”

অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন।

০১৭৩২-৯৫৩৬৭০

আল্লাহ ও রাসূলের আহ্বানে সাড়া দেয়ার সুফল

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

{الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ. الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ. إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ}

অনুবাদঃ 'যখম হওয়ার পর যারা আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে। তাদের মধ্যে যারা সৎকাজ করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে চলে তাদের জন্য মহাপুরস্কার রয়েছে। এদেরকে লোকেরা বলেছিল, তোমাদের বিরুদ্ধে লোকজন জড়ো হয়েছে, কাজেই তোমরা তাদেরকে ভয় কর; কিন্তু এ কথা তাদের ঈমানকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং তারা বলেছিল, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম অভিভাবক। তারপর তারা আল্লাহর নি'য়ামাত ও অনুগ্রহসহ ফিরে এসেছিল, কোন অনিষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করেনি এবং আল্লাহ যাতে সন্তুষ্ট তারা তারই অনুসরণ করেছিল এবং আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল। সে তো শাইতান। সে তার বন্ধুদের ভয় দেখায়; কাজেই যদি তোমরা মু'মিন হও তবে তাদেরকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় কর', [আল 'ইমরান- ৩: ১৭২- ১৭৫]।

নামকরণঃ সূরার ৩৩ নং আয়াতে উল্লেখিত 'আল 'ইমরান' শব্দটিকে নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে, যার অর্থ 'ইমরান বংশধর।

নাযিলের সময়ঃ সূরাটি সর্বসম্মতিক্রমে মাদানী সূরা, [তাফসীরুল কুরতুবী ৪/১, তাফসীর ইবন কাসীর ২/৫]।

মূল আলোচ্য বিষয়ঃ শারী'য়াতের মূলনীতিসমূহ; 'আকীদাহ, তাওহীদ, নাবুওয়াত, পরকাল, 'আদল- ইনসাফ প্রতিষ্ঠা। ইসলামের কতিপয় আরকান ও ফারায়িয; হাজ্জ, জিহাদ, প্রকৃত মু'মিন ও মুনাফিকদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে

আলোচনা করা হয়েছে, [বিস্তারিত দেখুন; আলে 'ইমরান- আয়াত নং ১৬৬- ১৬৮ এর দারস। শিরনাম 'সত্য মু'মিন ও মুনাফিকদের মধ্যে স্পষ্টভাবে পার্থক্য করা আল্লাহর স্থায়ীনীতি']।

সংক্ষিপ্ত তাফসীর ও ব্যাখ্যা: আলোচ্য আয়াতগুলোতে যেসব মু'মিন- মুসলিম সুখে- দুঃখে, সুস্থ- অসুস্থ, বিপদে- আপদে সকল অবস্থায় মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দেয় তাদের বিশাল পুরস্কারের ঘোষণা রয়েছে। তারা আল্লাহ সুবহানাহু ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য প্রদর্শন করে উত্তম কাজ এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে। তারা আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় পায় না। তাদের বিরুদ্ধে সকল দুশমন ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেলেও তারা তার ভ্রক্ষেপ করে না। তাদেরকে নিশ্চিত পরাজয়ের ভীতি প্রদর্শন করলেও তারা ভীত- সন্ত্রস্ত তো হয়ই না বরং তাদের অন্তরে ঈমান আরও বৃদ্ধি পায়। তাদের আস্থা আল্লাহ তা'আলার প্রতি আরও গভীর হয় এবং আল্লাহকেই তার একমাত্র কর্মবিধায়ক, অভিভাবক ও তত্বধায়ক বলে বিশ্বাস করে এবং সকলের সামনে তা ঘোষণা করে। **আলোচ্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন,** {الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ} **'যখম হওয়ার পর যারা আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে। তাদের মধ্যে যারা সৎকাজ করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে চলে তাদের জন্য মহাপুরস্কার রয়েছে**। অর্থাৎ উহুদ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর বিপর্যয়ের কারণে তাদের অনেক বড় ক্ষতি হয়। তাদের মধ্যে অনেকেই শাহাদাত বরণ করে বাকীরা আহত ও যখমপ্রাপ্ত হয়, এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত প্রচন্ড আঘাতপ্রাপ্ত হন। এমতাবস্থায় মুশরিকগণ মাক্কার দিকে প্রত্যাবর্তন করে বটে, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশংকা করছিলেন যে, তারা পুনরায় ফিরে এসে আক্রমণ করতে পারে। তাই তিনি তাদের পিছু নিয়ে ধাওয়া দেয়ার জন্য এই আহত সাহাবীদেরকে আহ্বান করেন। সে আহ্বানে যারা সাড়া দিয়েছিলেন, তাদের পুরস্কারের কথাই এ আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে। এ আয়াত প্রসঙ্গে 'উরওয়া ইবন যুবাইর (রা) বলেন, আমাকে 'আয়িশা (রা) বলেছেন,

يَا ابْنَ أُخْتِي، كَانَ أَبَوَاكَ مِنْهُمْ: الزُّبَيْرُ، وَأَبُو بَكْرٍ، لَمَّا أَصَابَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَصَابَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَانْصَرَفَ عَنْهُ الْمُشْرِكُونَ، خَافَ أَنْ يَرْجِعُوا، قَالَ: مَنْ يَذْهَبُ فِي إِثْرِهِمْ، فَانْتَدَبَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلًا، قَالَ: كَانَ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ، وَالزُّبَيْرُ

হে আমার বোনের ছেলে! তাদের মধ্যে তোমার পিতারা; যুবাইর ও আবু বাকর (রা) ছিলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উহুদ যুদ্ধের দিনে আহত হয়েছিলেন আর মুশরিকগণ তার কাছ থেকে চলে গিয়েছিল, তখন তিনি তাদের পুনরায় ফিরে আসার আশংকা করেছিলেন। তিনি বলেন, কারা তাদের পেছনে অনুসরণ করবে? তখন সাহাবীদের মধ্যে সত্তর জন ব্যক্তি ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন।

বর্ণনাকারী বলেন, তাদের মধ্যে আবু বাকর ও যুবাইর (রা) ছিলেন, [সাহীহুল বুখারী ৫/১০২, নং ৪০৭৭, সাহীহ মুসলিম ৪/১৮৮১, নং ২৪১৮]। মহান আল্লাহ সুবহানাহু মু'মিন মুসলিমদের প্রতি এ নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহ্বানে সাড়া দেয়। সাড়া দেয়া ছাড়া তাদের আর কোন পথ খোলা নেই। আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দেয়ার অর্থ তাদের সিদ্ধান্ত নির্দিধায় মেনে নেয়া। আল-কুরআনে এসব বিষয়ে বিভিন্ন আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ}

'হে মু'মিনগণ! রাসূল যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে ডাকে যা তোমাদেরকে জীবন্ত করে, তখন তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দেবে এবং জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ মানুষ ও তার হৃদয়ের মাঝে অন্তরায় হন। আর নিশ্চয় তাঁরই দিকে তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে', [আল আনফাল- ৮: ২৪]।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ}

'তোমরা তোমাদের রবের ডাকে সাড়া দাও আল্লাহর পক্ষ থেকে সে দিন আসার আগে, যা প্রতিরোধ করা যায় না; যেদিন তোমাদের কোন আশ্রয়স্থল থাকবে না এবং তোমাদের কোন অস্বীকার করার উপায় থাকবে না', [আশ্ শুরা- ৪২: ৪৭]।

আল্লাহ সুবহানাহু বলেন,

{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا}

'আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ের ফায়সালা দিলে কোন মু'মিন পুরুষ এবং মু'মিন নারীর জন্য সে বিষয়ে তাদের কোন (ভিন্ন সিদ্ধান্তের) এখতিয়ার নেই। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করে সে স্পষ্টভাবে পথভ্রষ্ট হয়', [আল আহযাব- ৩৩: ৩৬]। এ আয়াতের তাফসীরের পর ইবন কাসীর (রহ) বলেন,

فَهَذِهِ الْآيَةُ عَامَّةٌ فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا حَكَمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ بِشَيْءٍ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مُخَالَفَتُهُ وَلَا اخْتِيَارَ لِأَحَدٍ هَاهُنَا، وَلَا رَأْيَ وَلَا قَوْلَ

এ আয়তটি সাধারণভাবে সকল বিষয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কেননা যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দেন তখন কারো জন্য তার বিরোধীতা বা আপত্তি করার অধিকার নেই। এ সিদ্ধান্তের বিপরীতে কারো ভিন্ন কিছু বলার ও মতামত দেয়ার

এখতিয়ারই নেই। অতঃপর হাফিয ইবন কাসীর আল-কুরআন ও সুন্নাহর নিম্নোক্ত দলীলসহ আরো অনেক প্রমাণ পেশ করেন, [তাফসীর ইবন কাসীর ৬/৪২৩, আর দেখুন: আশ্ শানকীতী, আদওয়াউল বায়ান ৪/৩৩৩, ৪২৭, ৫৫৯]। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}

'কিন্তু না, আপনার রবের কসম! তারা মু'মিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেদের বিবাদ- বিসম্বাদের ব্যাপারে আপনাকে বিচারক না মানে। অতঃপর আপনার ফায়সালা সম্পর্কে তাদের মনে কোন দ্বিধা থাকবে না এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়', [আন্ নিসা- ৪: ৬৫]।

আল্লাহ তা'আলা আর বলেন,

{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}

'রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাক এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর; নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর', [আল হাশর- ৫৯: ৭]। অন্য আরেকটি আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহ্বানকে সাধারণ মানুষদের আহ্বান ও ডাকের মতো মনে করতে নিষেধ করা হয়েছে। একইভাবে রাসূলুল্লাহর নির্দেশ ও সিদ্ধান্তের বিরোধীতা করতেও কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

{لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}

'তোমরা রাসূলের আহ্বানকে তোমাদের একে অপরের আহ্বানের মত গণ্য করো না; তোমাদের মধ্যে যারা একে অপরকে আড়াল করে অলক্ষ্যে সরে পড়ে আল্লাহ তো তাদেরকে জানেন। কাজেই যারা তার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদের উপর আপতিত হবে অথবা তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নেমে আসবে' [আন্ নূর- ২৪: ৬৩]।

আয়াতটির শেষাংশের অর্থ হচ্ছে; যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রদর্শিত পথ, উপস্থাপিত দীনের বিরোধিতা করে তার প্রবর্তিত শারী'য়াত ও আইন অনুসারে জীবন পরিচালনা করে না, তার সুন্নাত ও রীতি-নীতির বিরোধিতা করে, তারা যেন তাদের অন্তরে কুফরী, নিফাকী, বিদ'আত ইত্যাদি লালন করে। তাদের জন্য এ আশংকা রয়েছে যে, তারা কুফরীতে নিপতিত হবে এবং তাদের উপর কঠোর শাস্তি নেমে আসবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করবে যা আমার প্রদর্শিত পথের উপর নয়, তা তার উপরই ফিরিয়ে দেয়া

হবে', অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য হবে না, [সাহীহুল বুখারী ৩/১৮৪, নং ২৬৯৭, সাহীহ মুসলিম ৩/১৩৪৩, নং ১৭১৮]।

বিভিন্ন হাদীসেও এ কথাটির সমর্থন রয়েছে। 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আমর ইবনুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ .

'তোমাদের কোন ব্যক্তি মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ না তার প্রবৃত্তি আমি যে জীবন-পদ্ধতিসহ আগমণ করেছি তার অধীনতা স্বীকার করে নেবে', [ইবন আবি 'আসিম, আস্ সুন্নাহ ১/১২, নং ১৫, আল বাগাভী, শারহুস সুন্নাহ ১/২১৩, নং ১০৪, ইবন বাত্তাহ, আল ইবানাহ ১/৩৮৭, নং ২৭৯, আলবানী হাদীসটিকে যদিও যা'য়ীফ বলেছেন কিন্তু অন্যান্য অকাট্য দলীল-প্রমাণ হাদীসটির অর্থকে শক্তিশালীভাবে সাব্যস্ত করে]। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার আমাদের কাছে বক্তৃতার সময় বলেন,

"...فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ".

'অতঃপর আমি যখন তোমাদেরকে কোন বিষয়ে নির্দেশ দেই তখন তোমরা সাধ্যমত তা কার্যকর করবে। আর যখন কোন বিষয় নিষেধ করি তখন তা তোমরা পরিত্যাগ করবে', [সাহীহ মুসলিম ২/৯৭৫, নং ১৩৩৭]। আবু সা'ঈদ ইবনুল মু'আল্লা (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে, তিনি বলেন:

كُنْتُ أُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ، فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أُجِبْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي، فَقَالَ: أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ: {اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ}

আমি সালাত আদায় করছিলাম তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ডাকেন। আমি তার ডাকে সাড়া না দিয়ে সালাত আদায় করলাম অতঃপর তার কাছে আসলাম। তখন তিনি বলেন, আমার কাছে আসতে তোমাকে কিসে নিষেধ করেছে? তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি সালাত আদায় করছিলাম। তিনি বলেন, আল্লাহ কি বলেননি? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ.. 'হে মু'মিনগণ! রাসূল যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে ডাকে যা তোমাদেরকে জীবন্ত করে, তখন তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দেবে', [আল আনফাল- ৮: ২৪, দেখুন: সাহীহুল বুখারী ৬/১৭, নং ৪৪৭৪, মুসনাদ আহমাদ ২৯/৩৯৫, নং ১৭৮৫১]।

আল কুরআন ও সাহীহ সুন্নাহর এ সব দলীল থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের আহ্বানে সাড়া দেয়া সকল মুসলিমের জন্য অপরিহার্য। আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ ও নিষেধ মেনে চলা ফারয। সাহাবায়ে কিরাম আল্লাহ সুবহানাহু ও তাঁর রাসূলের আদেশ ও নিষেধকে সঙ্গে সঙ্গে পরিপালন করেছেন। সাহীহ হাদীসে এর অনেক উদাহরণ রয়েছে। মদ চূড়ান্তভাবে হারাম ঘোষিত হওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে

সাহাবীগণ তা ত্যাগ করেছেন, পাত্রে রক্ষিত সব মদ ফেলে দিয়েছেন। ফলে মাদীনার রাস্তাগুলো বৃষ্টির পানির মতো মদের প্লাবন বয়ে গিয়েছিল।

গৃহপালিত গাধার গোশত হারাম ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাহাবায়ে কিরাম তা ত্যাগ করেছেন। এমনকি যুদ্ধের ময়দানে প্রচন্ড ক্ষুধার সময় গাধার গোশত উনুনের উপর রান্না হচ্ছিল। পাতিলের মধ্যে পাকানো গোশত টগবগ করছিল। খাওয়ার জন্য তা প্রায় প্রস্তুত হচ্ছিল। এমন সময় গৃহপালিত গাধার গোশত হারাম ঘোষিত হলো। ক্ষুধার্ত সাহাবায়ে কিরাম (রা) কাল বিলম্ব না করে সঙ্গে সঙ্গেই পাতিল উল্টিয়ে রান্না হওয়া গোশতসহ সব ফেলে দিলেন।

আলোচ্য আয়াতেও মহান আল্লাহ সাহাবায়ে কিরামের ত্যাগের কথা তুলে ধরেছেন এবং তাদেরকে প্রত্যয়ন করছেন যে, তারা উহুদ যুদ্ধে শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে রক্তাক্ত শরীর, ক্ষত-বিক্ষত দেহ এবং আহত অবস্থায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়ে মুশরিকদের পিছু নিয়ে তাদেরকে তাড়া করেছিলেন। ঘটনাটি ছিল এমন যে, উহুদের যুদ্ধে কাফিরগণ ময়দান থেকে ফিরে মাক্কার দিকে যাত্রা করল। পথে তাদের মনে হলো আমাদের ফিরে না এসে এই সুযোগে আক্রমণ চালিয়ে মুসলিমদেরকে খতম করা উচিত ছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের মনে প্রচন্ড ভয়ের সঞ্চার করে দিলেন। ফলে তারা ফিরে যাবার সময় মাদীনাযাত্রী এক পথিকের কাছে তারা আক্রমণ করার জন্য ফিরে আসছে এমন প্রচারণা চালাতে বলল। বিষয়টি ওহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতে পেরে যুদ্ধ ফেরত আহত মুসলিমদেরকে 'হামরাউল -আসাদ' পর্যন্ত মুশরিকদের পশ্চাদ্ধাবন করার নির্দেশ দিলেন। আত্র আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে 'আয়িশা (রা) 'উরওয়াহ ইবনুয যুবাইর (রা)কে বলেন, 'উহুদ যুদ্ধের দিনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যথেষ্ট আক্রান্ত হয়েছিলেন। মুশরিকগণ তার কাছ থেকে চলে গিয়েছিল। তারা পুনরায় ফিরে আসতে পারে তিনি এমন আশংকা করলেন। তাই তিনি বলেন, 'কে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করবে'? তখন তাদের মধ্য থেকে সত্তর জন সাহাবী সাড়া দিলেন, [সাহীহুল বুখারী ৫/১০২, নং ৪০৭৭, আর দেখুন, তাফসীর ইবন কাসীর ২/১৬৬-১৬৭]। এ অভিযানকে 'গাযওয়াহ হামরাউল- আসাদ' বলা হয়। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে তিন দিন অবস্থান করে মাদীনায় ফিরে আসেন, [আর- রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ২৫৮, 'আরবী, তাফসীরুল বাগাভী১/৫৪০, ইবন কাসীর ২/১৬৮]।

মহান আল্লাহর পবিত্র বাণী, {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ} 'এদেরকে লোকেরা বলেছিল, তোমাদের বিরুদ্ধে লোকজন জড়ো হয়েছে, কাজেই তোমরা তাদেরকে ভয় কর; কিন্তু এ কথা তাদের ঈমানকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং তারা বলেছিল, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম অভিভাবক', [আল 'ইমরান- ৩: ১৭৩]। এ আয়াতের

শানে নুযূল সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, সাহাবায়ে কিরাম যখন 'হামরাউল- আসাদ' নামক স্থানে পৌঁছালেন, তখন সেখানে নু'আইম ইবন মাস'উদের সাথে সাক্ষাত হয়। সে সংবাদ দিল যে, আবু সুফইয়ান নিজের সাথে আরও সৈন্য সংগ্রহ করে পুনরায় মাদীন আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তোমরা তাদেরকে ভয় কর। ক্ষত-বিক্ষত দুর্বল সাহাবীগণ এই ভীতিজনক সংবাদ শুনে সমস্বরে বলে উঠলেন, আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম অভিভাবক। 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন, 'আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, আর তিনিই আমাদের জন্য উত্তম অভিভাবক', এ কথাটি ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামকে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয় তখন তিনি বলেছিলেন। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথাই বলেছিলেন, যখন লোকজন তাকে এসে খবর দেয় যে, আপনাদের বিরুদ্ধে বিরাট সেনাদল প্রস্তুত করা হয়েছে। তাদেরকে ভয় করুন। এ কথা শুনে তাদের ঈমান আরো সুদৃঢ় হয়, তারা বলে, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আর আমাদের দায়িত্ব পালনে তিনিই উত্তম যিম্মাদার', [সাহীহুল বুখারী ৬/৩৯, নং ৪৫৬৩, আর দেখুন, তাফসীরুল বাগাভী ১/৫৪২, ইবন কাসীর ২/১৬৯, আদওয়াউল বায়ান ৪/১৬৪]।

আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী, {فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ} 'তারপর তারা আল্লাহর নি'য়ামাত ও অনুগ্রহসহ ফিরে এসেছিল, কোন অনিষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করেনি এবং আল্লাহ যাতে সন্তুষ্ট তারা তারই অনুসরণ করেছিল এবং আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল'। [আল- 'ইমরান- ৩: ১৭৪]। এ আয়াতে যে সব সাহাবায়ে কিরাম জিহাদের জন্য বের হওয়া এবং হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল' বলার ফাযীলত, কল্যাণ ও উপকারীতা বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ এরা আল্লাহর দান ও অনুগ্রহ নিয়ে ফিরে এসেছে। তাতে তাদের কোন ক্ষতি হয়নি বরং তারা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার অনুগত হয়েছে। মহান করুণাময় আল্লাহ তাদেরকে তিনটি নি'য়ামাত দিয়ে ধন্য করেছেন, এগুলো হলো; (১) আল্লাহ কাফিরদের মনে ভীতির সঞ্চার করে দিয়েছেন, তাই তারা পালিয়ে গেল। ফলে সাহাবীগণ (রা) যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে নিরাপদ থাকলেন। এটাকে আল্লাহ 'নি'য়ামাত' বলেই আখ্যায়িত করেছেন, (২) 'হামরাউল- আসাদ' এর বাজারে তাদের যে ব্যবসা-বানিজ্যের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে তারা লাভবান হয়েছিলেন এবং কাফিরদের ফেলে যাওয়া গানীমাতের সম্পদ থেকে তারা যে লাভবান হয়েছিলেন তাকেই আয়াতে 'ফাযল' বলা হয়েছে, (৩) আর আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হয়েছেন, যা ছিল সব নি'য়ামাত ও প্রাপ্তির উর্ধ্বে। এটিকে এই জিহাদে তাদেরকে বিশেষ পদ্ধতিতে দেয়া হয়েছে যে, তারা সরাসরি যুদ্ধ না করেও জিহাদের সর্বোচ্চ প্রাপ্তি ও পুরস্কার তাদেরকে দেয়া হয়েছে, [তাফসীরুল বাগাভী ১/৫৪২, আর দেখুন, কুরআনুল কারীম, বাংলা অনুবাদ ১/৩৬৪]।

আল্লাহ সুব্‌হানাহুর বাণী, {إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ} 'সে তো শাইতান! সে তার বন্ধুদের ভয় দেখায়'। এখানে 'সে' বলতে তাকে বোঝানো হয়েছে, যে ব্যক্তি মু'মিনদের কাছে এসে বলেছিল যে, তোমাদের বিরুদ্ধে মানুষ জড়ো হয়েছে, কাজেই তোমরা তাদের ভয় করো। তোমরা তাদের সামনে নিতান্তই দুর্বল। সে তার দোসর কাফিরগণকে মুসলিমদের কাছে বড় শক্তিধর করে তুলে ধরেছিল। সে কাফিরদের হয়েই মুসলিমদের মনবল ভেঙ্গে দেয়ার কাজ করছিল। তারা ছিল বানু 'আব্দুল কায়েসের কিছু লোক, [তাফসীরুত তাবারী ৭/৪১৬, তাফসীরুল বাগাভী ১/৫৪২, ইবন কাসীর ২/১৭২]।

শাইতানের বন্ধু কারা? আল-কুরআন ও সাহীহ হাদীসে শাইতানের বন্ধু ও দোসরদের পরিচয় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, তারা হচ্ছে, কাফির- মুশরিক, মুনাফিক ও সকল ইসলাম বিরোধীগণ, [আদওয়াউল বায়ান ৩/২৯২]। আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেন,

{الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا}

'যারা মু'মিন তারা আল্লাহর পথে লড়াই-সংগ্রাম করে, আর যারা কাফির তারা তাগূতের পথে লড়াই করে। অতএব তোমরা শাইতানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; শাইতানের কৌশল অবশ্যই দুর্বল', [আন্ নিসা- ৪: ৭৬]। ইসলাম বিরোধী ও কাফিররা তাগুতের পথে লড়াই-সংগ্রাম করে। তাই তারা শাইতানের বন্ধু ও দোসর। শাইতানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রাম করার নির্দেশ এ আয়াতে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু আর বলেন,

{إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ}

'নিশ্চয় আমরা শাইতানদেরকে তাদের বন্ধু- অভিভাবক করেছি, যারা ঈমান আনে না', [আল আ'রাফ- ৭: ২৭]। অর্থাৎ যারা অমুসলিম ও মু'মিন নয়, আল্লাহর দীন ইসলামকে নিজেদের দীন হিসেবে গ্রহণ করেনি তারাই শাইতানের বন্ধু ও দোসর। আল্লাহ তা'আলা আর বলেন,

{وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ}

'আর যারা কুফরী করে তাদের অভিভাবক হল তাগূত, তারা তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারে নিয়ে যায়', [আল-বাকারাহ- ২: ২৫৭]। তাহলে আল্লাহরদ্রোহী ও তার বিধান, ইসলামের বিরোধীরা মানুষদেরকে আলোর পথ থেকে অন্ধকার পথে নিয়ে যায়, শান্তি ও মুক্তির পথ থেকে শান্তি ও দাসত্বের পথে নিয়ে যায়। শাইতানের প্রভাবও কেবল কাফির-মুশরিক ও তার দোসরদের উপরই পড়ে। প্রকৃত ও নিষ্ঠাবান মু'মিনদের উপর তার কোন প্রভাব কার্যকর হয় না। ইবলীস প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ}

'নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও তাদের রবের উপর নির্ভর করে তাদের উপর তার কোন আধিপত্য নেই। তার প্রভাব তো শুধু তাদেরই উপর যারা তাকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে আর যারা আল্লাহর সাথে শারীক করে', [আন্ নাহল- ১৬: ৯৯-১০০]। অর্থাৎ যারা শাইতানের অনুসরণ করে বা তাকে অভিভাবক বানায় তাদেরকেই সে পথভ্রষ্ট করে, [তাফসীর ইবন কাসীর ৪/৬০২]। যারা শাইতানকে বন্ধু ও অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে, তার কথা মত চলে তারা সর্বত্রই মহাক্ষতি ও শাস্তির মধ্যে পতিত হয়। তা থেকে তাদের নিস্তারের কোন আশা নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا}

'আর কেউ আল্লাহর পরিবর্তে শাইতানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করলে সে স্পষ্টতঃই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সে শাইতান তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদের হৃদয়ে মিথ্যা আশার সঞ্চার করে। আর শাইতান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা ছলনা মাত্র। তাদেরই আশ্রয়স্থল জাহান্নাম, তা থেকে তারা নিস্কৃতির উপায় পাবে না', [আন্ নিসা- ৪: ১১৯- ১২১]।

মহান আল্লাহর বাণী, {فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} 'কাজেই যদি তোমরা মু'মিন হও তবে তাদেরকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় কর', [আল 'ইমরান- ৩: ১৭৫]। অর্থাৎ শাইতান তোমাদেরকে যে ভয় দেখিয়ে প্রলুব্ধ করতে চায় এবং তোমাদের অন্তরে দুর্বলতা ঢালতে চায়, তোমরা তাকে পাত্তা দিও না। তাদের ভয়ে ভীত হবে না। বরং আমার প্রতি গভীর আস্থা ও মজবুত আশা রাখ আমি তোমাদেরকে সাহায্য করব, তোমাদেরকে বিজয় দান করব এবং সার্বিক কল্যাণে ধন্য করব, [তাফসীর ইবন কাসীর ২/১৭২]। তাই শাইতানের সকল চক্রান্তের মোকাবেলায় তোমাদের একমাত্র মনিব আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ}

'আল্লাহ লিখে রেখেছেন, আমি ও আমার রাসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হব। নিশ্চয় আল্লাহ মহাশক্তিমান, মহাপরাক্রমশালী', [আল মুজাদালাহ- ৫৮: ২১]।

শিক্ষাসমূহ, আয়াতগুলোর অনেক শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কতিপয় শিক্ষা হলো;

এক. সর্বাবস্থায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ- নিষেধ মেনে চলতে হবে। মনে রাখতে হবে এ ক্ষেত্রে ওযর- আপত্তি গ্রহণযোগ্য নয়।

দুই. সকল অবস্থায় আল্লাহর দীন ও দীন বিজয়ের স্বার্থে নির্দ্বিধায় প্রয়োজনীয় সকল

ধরনের ত্যাগ- তিতিক্ষা ও কুরবানী পেশ করা মু'মিন- মুসলিমদের জন্য অপরিহার্য। এ জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে।

তিন. বাস্তব ময়দানে কঠিন মুহূর্তে আল্লাহর প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও আস্থার পরীক্ষা দিতেই হবে। সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণের উপর মুসলিমদের বিজয় নির্ধারিত হয়। মু'মিনদের তা মনে রাখা উচিত।

চার. আল্লাহ তা'আলাই মু'মিনদের একমাত্র উত্তম অভিভাবক, এ বিশ্বাস গভীরভাবে মনে লালন করতে হবে।

পাঁচ. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য এবং ঈমানের দাবীগুলো পূরণ হলেই কেবল মু'মিনদের জন্য সর্বোত্তম পুরস্কার অর্জিত হয়। এ কথা সর্বদা মনে রাখা জরুরী।

ছয়. মু'মিনদেরকে সর্বক্ষণ শাইতানের প্ররোচনা ও বিভ্রান্তের কলা- কৌশল সম্পর্কে সতর্ক থাকা আবশ্যক; যাতে শাইতানের জালে আটকে যেতে না হয়। এ জন্যে আল্লাহর সাহায্য চাওয়া উচিত।

সাত. আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কাউকে সে রকম ভয় করা যাবে না, যে ভয় কেবল আল্লাহকেই করতে হয়। কেননা 'ভয়' একটি অন্যতম 'ইবাদাত। তা কোন অবস্থাতেই আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্যে হবে না। তাহলে তা হবে শিরক। কঠিনভাবে তা মনে রাখতে হবে।

করুণাময় আল্লাহ আমাদেরকে উপর্যুক্ত শিক্ষাগুলো বাস্তবায়ন করার তাওফীক দান করুন! আমীন!!

প্রফেসর শাইখ ড. মুহাম্মাদ আব্দুস সামাদ

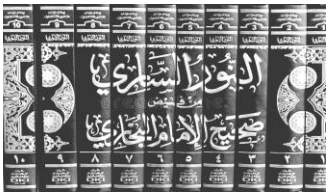

সৃষ্টির প্রতি সদয় আচরণ : ইসলামী সংস্কৃতির অন্যতম অনুষঙ্গ

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ.

অনুবাদ

শাদ্দাদ ইবন আওস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে দুটি কথা মুখস্থ করেছি। তিনি বলেছেন, "আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে তোমাদের ওপর 'ইহ্সান' (সদাচরণ) অপরিহার্য করেছেন। সুতরাং তোমরা যখন কতল করবে, দয়া প্রদর্শন করবে। আর তোমরা যখন (কোনো প্রাণী) যবেহ করবে, দয়া প্রদর্শন করবে। সুতরাং তোমাদের কেউ যখন (কোনো প্রাণী) যবেহ করে, সে যেনো তার ছুরি ধার দিয়ে নেয় এবং তার যবেহকৃত জন্তুটিকে প্রশান্তি দেয়"।[১]

ব্যাখ্যা

মহান আল্লাহ আমাদেরকে যেসব বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টিনিবদ্ধ করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন সদাচরণ সেসবের অন্যতম। সৃষ্টির প্রতি সদয় হওয়ার আরবী প্রতিশব্দ হচ্ছে 'ইহ্সান' (الإِحْسَانَ)। এর মূলশব্দ রূপ হচ্ছে, হাসানুন (حسن)। এর অর্থ- দয়া প্রদর্শন করা, সদয় হওয়া এবং যা সুন্দর, তা উত্তমরূপে সম্পাদন করা ইত্যাদি। যেমন মহান আল্লাহর বাণী–

وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ...

"তিনি (আল্লাহ) আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত করে আমার প্রতি সদাচরণ করেছেন"...।[২]

হাদীসে 'আল-ইহসান' শব্দটি ইখলাস (নিষ্ঠা) অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন-

قَالَ مَا الإِحْسَانُ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ .

---

১. মুসলিম, কিতাবুয যাবায়িহ ওয়াস-সায়্যিদ, বাব : আল-আমরু বি-ইহ্সানিয-যাবহি ওয়াল কাতল, নং ৫১৬৭

২. ১২-সূরা ইউসুফ : ১০০

"...জিবরীল (আ) বলেন, ইহ্সান কী? নবী (সা) বলেন, এমনভাবে আল্লাহর 'ইবাদাত করবে যে, তুমি আল্লাহকে দেখছো। আর যদি তাঁকে দেখতে না পাও তাহলে মনে রাখবে, তিনি তোমাকে দেখছেন"...।[৩]

عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا حكمتم فاعدلوا وإذا قتلتم فأحسنوا فإن الله عز و جل محسن يحب الإحسان.

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "তোমরা যখন বিচার করবে, ন্যায়বিচার করবে। আর যখন তোমরা হত্যা করবে, সদয় আচরণ করবে। কেননা মহান আল্লাহ সৎকর্মশীলদের প্রতিদান প্রদানকারী, তিনি সদয় আচরণ পছন্দ করেন"।[৪]

সৃষ্টির প্রতি সদয় হওয়ার গুরুত্ব

কেবল মানুষই নয়, বরং সকল মাখলূক মহান আল্লাহর পরিবারভুক্ত। সৃষ্টির প্রতি তাঁর ইহ্সান সর্বাধিক। সুতরাং মানুষসহ সর্ববিধ প্রাণির প্রতি সদয় আচরণ করা অপরিহার্য কর্তব্য। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

"আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকাজ ও সীমালঙ্ঘন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো"।[৫]

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ.

"তুমি সদয় হও যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের ভালোবাসেন না"।[৬]

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

"যারা আমার উদ্দেশে সংগ্রাম করে আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করবো। আল্লাহ অবশ্যই সৎকর্মশীলদের সাথে রয়েছেন"।[৭]

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

আল্লাহ সদাচরণকারীদেরকে ভালোবাসেন"।[৮]

---

৩. বুখারী, কিতাবুল ঈমান, বাব: সুওয়ালু জিবরীলিন নাবি্য স. আ'নিল ঈমান, নং ৫০
৪. আত-তাবারানী, আল-মু'জামুল আওসাত, নং ৪০, হাদীসটির সকল রাবী বিশ্বস্ত
৫. ১৬-সূরা আন-নাহল : ৯০
৬. ২৮- সূরা আল-কাসাস : ৭৭
৭. ২৯-সূরা আল-আনকাবূত : ৬৯
৮. ৫-সূরা আল-মায়িদা: ৯৩

عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخَلْقُ عِيَالُ اللهِ، فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عِيَالِهِ".

'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)বলেছেন, "সকল মাখলূক আল্লাহর পরিবার। সুতরাং মাখলূকের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তি সর্বাধিক প্রিয়, যে তাঁর পরিবারের সাথে সদয় আচরণ করে"।[৯]

মানবজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে ইহ্সানের নির্দেশ

মহান আল্লাহ তাঁর মাখলূকের প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। এই সদয় আচরণ হবে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায়ে।

ব্যক্তি জীবনে ইহ্সান

মহান আল্লাহ মানুষের ওপর যতগুলো দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের নির্দেশ দিয়েছেন সেসবের অন্যতম হলো নিজের প্রতি সদয় হওয়া। যেমন-

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا...

"তোমরা সদাচরণ করলে সদাচরণ করবে নিজেদের জন্য এবং মন্দকাজ করলে তাও করবে নিজেদের জন্য"...।[১০]

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.

"তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করো এবং নিজেদের হাতে নিজেদের ধ্বংস করো না। তোমরা সদয় হও। নিশ্চয় আল্লাহ সদয় আচরণকারীদের ভালোবাসেন"।[১১]

পারিবারিক জীবনে ইহ্সান

পারিবারিক জীবন সুখময় হয় পারস্পরিক সদাচরণের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির প্রতি সদাচরণের বিষয়টি একান্ত প্রাসঙ্গিক। মহান আল্লাহ বলেন-

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا.

"তোমরা তাদের (নারী) সাথে সৎভাবে জীবন যাপন করবে। তোমরা যদি তাদের অপছন্দ কর তবে এমনও হতে পারে যে, আল্লাহ যাতে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন তোমরা তা অপছন্দ করছো"।[১২]

কোনো ব্যক্তির যদি তার স্ত্রীকে তালাকদান অপরিহার্য হয়ে পড়ে তখনও সে তার প্রতি সদয় আচরণ করবে, স্ত্রীর জন্য ক্ষতিকর হবে এমন কাজ সে করবে না। এক্ষেত্রেও স্ত্রীর প্রতি স্বামীর সদাচরণের বিষয়টি একান্ত প্রাসঙ্গিক। এবিষয়ে কুরআন ও হাদীসে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। যেমন-

---

৯. আল-বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান, নং ২৫২৮

১০. ১৭-সূরা বনী ইসরাঈল : ৭

১১. ২-সূরা আল-বাকারা: ১৯৫

১২. ৪-সূরা আন-নিসা: ১৯

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ...

"তালাক দু'বার। অতঃপর স্ত্রীকে হয় বিধিমত রেখে দিবে অথবা সদয়ভাবে বিদায় করে দিবে"...।[১৩]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا.

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)বলেছেন: "পূর্ণাঙ্গ মুমিন হলো তারা, যাদের আচরণ ভালো এবং তোমাদের মধ্যে সেসব লোক উত্তম, যারা তাদের স্ত্রীদের প্রতি সদাচরণকারী"।[১৪]

পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ

মহান আল্লাহ যতো ধরনের নি'আমত দান করেছেন তন্মধ্যে পিতা-মাতা অন্যতম। তাদের অপত্য স্নেহে আমরা বেড়ে ওঠেছি। সুতরাং তাদের প্রতি আমাদের অনেক করণীয় রয়েছে। এবিষয়ে কুরআন ও হাদীসে নির্দেশনা রয়েছে,

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا...

"তোমাদের প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন তিনি ব্যতীত অপর কারো ইবাদাত না করতে ও পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করতে"।[১৫]

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ...

"স্মরণ করো, যখন আমি বনী ইসরাঈলের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অপর কারো 'ইবাদাত করবে না, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন ও দরিদ্রদের প্রতি সদয় ব্যবহার করবে এবং মানুষের সাথে সদালাপ করবে"...।[১৬]

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا...

"বলো, এসো; তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যা হারাম করেছেন তা পড়ে শুনাই : তোমরা তাঁর কোনো শরীক করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করবে"...।[১৭]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رضى الله عنه – قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِى قَالَ « أُمُّكَ » . قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ « أُمُّكَ » . قَالَ ثُمَّ مَنْ

---

১৩. ২-সূরা আল-বাকারা : ২২৯
১৪. তিরমিযী, আবওয়াবুর রাদা,বাব: মা জাআ ফী হাক্কিল মারআতি আলা যাওজিহা, নং ১১৯৫
১৫. ১৭-সূরা বনী ইসরাঈল : ২৩
১৬. ২-সূরা আল-বাকারা : ৮৩
১৭. ৬-সূরা আল-আন'আম : ১৫১

قَالَ « أُمُّكَ » . قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ « ثُمَّ أَبُوكَ.

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল ! কে আমার সদাচরণ পাওয়ার অধিক হকদার ? তিনি বলেন, তোমার মাতা। সে বললো, তারপর কে? তিনি বলেন, তোমার মাতা। সে বললো, তারপর কে? তিনি বলেন, তোমার মাতা। সে বললো, তারপর কে? তিনি বলেন, তোমার পিতা" ।[১৮]

عَنْ عَبْد اللَّهِ بْن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَ أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ أَبْتَغِى الأَجْرَ مِنَ اللَّهِ. قَالَ « فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَىٌّ ». قَالَ نَعَمْ بَلْ كِلاَهُمَا. قَالَ « فَتَبْتَغِى الأَجْرَ مِنَ اللَّهِ ». قَالَ نَعَمْ. قَالَ « فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا.

'আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আ'স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "এক ব্যক্তি নবী (সা) এর নিকট এসে বললো, আমি আপনার নিকট হিজরত ও জিহাদের ব্যাপারে বায়'আত হওয়ার জন্য এসেছি। এর দ্বারা আমি আল্লাহর নিকট প্রতিদান কামনা করি। তিনি বলেন, তোমাদের পিতা-মাতার কোনো একজন জীবিত আছেন কি? তিনি বলেন, হাঁ, বরং তারা দু'জনেই জীবিত আছেন। তিনি বলেন, তুমি কি আল্লাহর নিকট প্রতিদান চাও? সে বললো, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে তোমার পিতা-মাতার নিকট ফিরে গিয়ে তাদের সাথে সদাচরণ কর। [১৯]

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى وَلَدِهِمَا قَالَ « هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ.

আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! সন্তানের ওপর পিতা-মাতার কী হক রয়েছে? তিনি বললেন, তারা তোমার জান্নাত কিংবা জাহান্নাম।[২০]

উপরোক্ত কুরআনের আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর 'ইবাদাতের পর পিতা-মাতার সাথে সদাচরণের গুরুত্ব অনেক। সুতরাং আমরা আমাদের পিতা-মাতার সাথে সাধ্যমত সদাচার করবো, তাঁদের খেদমত করবো এবং ভাল কাজে তাঁদের আনুগত্য করবো।

আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদাচরণ

আত্মীয়-স্বজনের প্রতি পারস্পরিক অনেক হক রয়েছে, যা পালনে রয়েছে বিপুল সাওয়াব এবং লঙ্ঘনে রয়েছে ভয়াবহ শাস্তির দুঃসংবাদ। কুরআন-হাদীসে উক্ত হক

---

১৮. বুখারী, কিতাবুল আদাব, বাব: মা আহাক্কুন-নাসি বিহুসসি-সুহবাহ, নং ৫৯৭১

১৯. মুসলিম, কিতাবুল বিররি ওয়াস-সিলাতি ওয়াল আদাব, বাব: বিররুল ওয়ালিদাঈনি ওয়া আন্নাহুমা আহাক্কু বিহি, নং ৬৬৭১

২০. ইবন মাজাহ, বাব : বিররুল ওয়ালিদাঈন, নং ৩৭৯৩

আদায়ের ব্যাপারে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ... جَنَّاتُ عَدْنٍ.

"এবং আল্লাহ যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন যারা তা অক্ষুণ্ন রাখে, ভয় করে তাদের প্রতিপালককে এবং ভয় করে কঠোর আযাব ... (তাদের জন্য রয়েছে) স্থায়ী জান্নাত"।[২১]

আর যারা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ পরিণাম। যেমন-

وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ.

"যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদের জন্য রয়েছে লা'নত এবং তাদের জন্য রয়েছে মন্দ আবাস" (জাহান্নাম)।[২২]

হাদীসেও আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুণ্ন রাখার গুরুত্ব এবং তা ছিন্ন করার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে নির্দেশনা রয়েছে। যেমন-

عَن جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ – صلى الله عليه وسلم – يَقُولُ « لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ.

জুবাইর ইবন মুত'ইম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সা) কে বলতে শুনেছেন : "আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না"। [২৩]

عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – ﷺ – قَالَ « مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.

আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা)বলেন, "যে ব্যক্তি কামনা করে যে, তার রিযিকে প্রশস্ততা আসুক এবং সে দীর্ঘায়ু হোক, সে যেনো তার আত্মীয়দের সাথে বন্ধন অটুট রাখে"।[২৪]

উপরোক্ত আলোচনা প্রমাণিত হয় যে, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী অভিশপ্ত এবং তার পরকালীন জীবনও হবে দুর্বিষহ।

প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ

প্রতিবেশির সাথে সদাচরণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ 'আমল। এক প্রতিবেশীর ওপর অপর প্রতিবেশীর দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। এ বিষয়ে ইসলামের নির্দেশনা সুস্পষ্ট। যেমন-

---

২১. ১৩-রা'দ : ২১-২৩
২২. ১৩-রা'দ : ২৫
২৩. বুখারী, কিতাবুল আদাব, বাব : ইসমুল কাতি', নং ৫৯৮৪
২৪. প্রাগুক্ত

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ...

"তোমরা আল্লাহর 'ইবাদাত করবে ও কোনো কিছুকে তাঁর সাথে শরীক করবে না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট-প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সংগী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে"...।[২৫]

عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ ...

আবূ শুরাইহ্ আল খুযা'ঈ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা)বলেছেন, " যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে সে যেনো তার প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করে"...।[২৬]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– كَيْفَ لِى أَنْ أَعْلَمَ إِذَا أَحْسَنْتُ وَإِذَا أَسَأْتُ فَقَالَ النَّبِىُّ –صلى الله عليه وسلم– « إِذَا سَمِعْتَ جِيرَانَكَ يَقُولُونَ قَدْ أَحْسَنْتَ فَقَدْ أَحْسَنْتَ وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ قَدْ أَسَأْتَ فَقَدْ أَسَأْتَ.

'আবদুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)কে বললো, "আমার জানার উপায় কি যে, কখন আমি একজন সদাচারী এবং কখন আমি একজন পাপাচারী? নবী (সা) বলেন, তুমি যখন তোমার প্রতিবেশীকে বলতে শোনবে, তুমি একজন সদাচারী, তখন তুমি নিজেকে সদাচারী মনে করবে। আবার যখন তুমি তাদের বলতে শোনবে, তুমি অসদাচরণ করছো, তখন তুমি নিজেকে অসদাচারী মনে করবে"।[২৭]

দুঃস্থদের সাথে সদাচরণ

মহান আল্লাহ দুঃস্থ জনগোষ্ঠীর প্রতি বিশেষভাবে সদয় আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। এবিষয়ে কুরআন ও হাদীসে ব্যাপক নির্দেশনা রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا...

"আত্মীয়-স্বজনকে তার প্রাপ্য দিবে এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও এবং কিছুতেই অপব্যয় করবে না"।[২৮]

فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

---

২৫. ৪-সূরা আন-নিসা: ৩৬

২৬. মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব: আল-হিস্সু আলা ইকরামিল জার, নং ১৮৫

২৭. আহমাদ, আল-মুসনাদ, নং ৩৪৮৫

২৮. ১৭-সূরা বনী ইসরাঈল: ২৬

"অতএব আত্মীয়কে তার প্রাপ্য প্রদান কর এবং অভঅবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে তাদের জন্য এটি উত্তম এবং তারাই সফলকাম"।[২৯]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ نَشَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَأَدْخَلَهُ جَنَّتَهُ رِفْقٌ بِالضَّعِيفِ وَشَفَقَةٌ عَلَى الْوَالِدَيْنِ وَإِحْسَانٌ إِلَى الْمَمْلُوكِ .

জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "যার মাঝে তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে আল্লাহ তার প্রতি তাঁর (রহমতের) ডানা প্রসারিত করবেন এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন: দুর্বলের সাথে মমত্বপূর্ণ ব্যবহার; পিতা-মাতার সাথে কোমল আচরণ এবং দাস-দাসীদের (অধীনস্থ) সাথে সদাচরণ"।[৩০]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « خَيْرُ بَيْتٍ فِى الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُحْسَنُ إِلَيْهِ وَشَرُّ بَيْتٍ فِى الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ.

আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, "মুসলিমদের ঘরসমূহের মধ্যে সেই ঘর সর্বোত্তম, যেখানে ইয়াতীম আছে এবং তার সাথে সদাচরণ করা হয়। আর মুসলিমদের ঘরসমূহের মধ্যে সেই ঘর সর্বনিকৃষ্ট, যেখানে ইয়াতীম আছে এবং তার সাথে দুর্ব্যবহার করা হয়"...।[৩১]

সুতরাং আমরা যেকোনো মূল্যে ইয়াতীম, মিসকীন ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সাথে সদাচরণ করবো।

জীব-জন্তুর প্রতি ইহ্সান

মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সকল সৃষ্টির প্রতি সদয় হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি জবেহের সময় ধারালো ছুরি ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন যাতে সেটির কষ্ট লাঘব হয়। এছাড়া পশু-পাখি আটক করে রেখে কষ্টদান থেকেও বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ – رضى الله عنهما – أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ « عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِى هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ ، لاَ هِىَ أَطْعَمَتْهَا وَلاَ سَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا ، وَلاَ هِىَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ .

'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "এক মহিলাকে একটি বিড়ালের কারণে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। সেটিকে সে আটকে রাখার কারণে মারা গিয়েছিল। এ কারণে সে জাহান্নামে গেলো। সে সেটিকে খাবারও দেয়নি এবং পানিও পান করায়নি, বরং সে আটক করে রেখেছে। সে সেটিকে ছেড়েও দেয়নি,

---

২৯. ৩০-সূরা আর-রূম : ৩৮

৩০. তিরমিযী, আবওয়াবু সিফাতিল কিয়ামা ওয়ার রিকাক, নং ২৬৮২

৩১. ইবন মাজাহ, কিতাবুল আদাব, বাব : হাক্কুল ইয়াতীম, নং ৩৮১০

যাতে সেটি যমীনের পোকা-মাকড় খেয়ে পারতো”।[৩২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – « أَنَّ رَجُلاً رَأَى كَلْبًا يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ ، فَأَخَذَ الرَّجُلُ خُفَّهُ فَجَعَلَ يَغْرِفُ لَهُ بِهِ حَتَّى أَرْوَاهُ ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ.

আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি দেখলো, একটি কুকুর পিাসার্ত হয়ে মাটি চাটছে। তখন লোকটি তার একটি মোজা নিয়ে তা দিয়ে সেটির জন্য অঞ্জলি ভরে পানি তুললো। এভাবে সে সেটির পিপাসা নিবারণ করলো। আল্লাহ তার এ কাজের প্রতিদান স্বরূপ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালেন।[৩৩]

যুক্তিতর্কেও সৌজন্যমূলক আচরণ করা

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ .

“ তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান করো হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে তর্ক করবে উত্তম পন্থায়”...।[৩৪]

অপর এক আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন-

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ

“তোমরা উত্তম পন্থা ব্যতীত আহলে কিতাবদের সাথে তর্ক করবে না, তবে তাদের মধ্যে যারা জালিম তাদের কথা ভিন্ন”...।[৩৫]

শিক্ষণীয় :

(১) মহান আল্লাহ সদাচরণকারীদের ভালোবাসেন।

(২) সদাচরণ, অন্তর কলুষমুক্ত রাখার শ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক।

(৩) ব্যক্তি,পরিবার ও আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে সদাচরণের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

(৪) সদাচরণের ফলে শত্রুতার অবসান ঘটে এবং মিত্রতা প্রতিষ্ঠা পায়।

(৫) সদাচরণ, আল্লাহর নৈকট্য লাভের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম।

(৬) সদাচরণের পরিসর সর্বব্যাপী। ■

অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ ছাইদুল হক

---

৩২. বুখারী, কিতাবু আহাদীসিল আম্বিয়া, বাব: ..., নং ৩৪৮২

৩৩. বুখারী, কিতাবুল উযূ, বাব: ইযা শারিবাল কালবু ফী ইনায়ি আহাদিকুম..., নং ১৭৩

৩৪. ১৬-সূরা আন-নাহল : ১২৫

৩৫. ২৯-সূরা আল-আনকাবূত : ৪৬

২৪ নং পৃষ্ঠায়

মীম ট্যুরস বিজ্ঞাপন

আন-নাওয়ার বিন্‌ত মালিক আল আনসারিয়্যাহ্ (রা)

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

নাবী (সা)-এর মক্কা থেকে মাদিনায় আগমনের দৃশ্যটি যদি আমাদের সামনে থাকে তাহলে তার মধ্যে মাদিনার আনসার পুরুষ ও নারীদের বদান্যতা ও অতিথি সেবার একটি চমৎকার চিত্র আমরা দেখতে পাবো। আনসার মহিলাদের অতিথি সেবা মানুষের আবেগকে উদ্বেলিত করে তোলে। সেই সাথে তাঁরা লাভ করেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা) সন্তুষ্টি ও ভালোবাসা।

আন-নাওয়ার বিন্‌ত মালিক আল আনসারিয়্যা (রা) উচুঁ মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারিনী একজন মহিলা সাহাবী। স্বভাবগত দিক দিয়ে তিনি একজন অতি উদার ও দানশীল। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা) সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই তার অর্থ সম্পদ ও একটি ছেলেকে রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে তুলে দেন।[১]

আন্-নাওয়ার বিন্‌ত মালিক (রা) এর প্রথম বিয়ে হয় ছাবিত ইবন দাহ্হাক আল খাযরাজীর সাথে। এ সংসারে তাঁর দুই ছেলে যায়দ ও ইয়াজিদ এর জন্ম হয়। পরবর্তী জীবনে এই যায়দ হন উতি উঁচু স্তরের একজন সাহাবী। আর আন-নাওয়ার (রা)-এর স্বামী ছাবিত মাদীনার বু'আছ যুদ্ধে নিহত হন। রাসূলুল্লাহর (রা) মাদিনায় হিজরতের পাঁচ বছর পূর্বে মাদিনার আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে এ যুদ্ধটি সংঘটিত হয়। যায়েদ এর বয়স তখন মাত্র ৬ বছর। আর স্বামী ছাবিত ইবন দাহহারের নিহত হবার পর নাওয়ার (রা) মদিনার নাজ্জার গোত্রের 'আম্মার ইবনে হাজমকে দ্বিতীয় বিয়ে করেন। উল্লেখ্য যে, সেই ইসলাম-পূর্ব যুগ থেকে মাদিনার আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে চলে আসছিল। তাতে উভয় গোত্রের বহু মানুষ নিহত-আহত হয়েছে। আর বু'আছ যুদ্ধটি হয় রাসূলুল্লাহর (সা) মাদিনায় আসার মাত্র কয়েক বছর আগে। অতঃপর মাদিনার নওমুসলিমদের অনুরোধে নিজের প্রতিনিধি হিসেবে মক্কা থেকে মুস'আব ইবন উমায়ের (রা) কে মাদিনায় পাঠান। মাদিনার অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। আর আমাদের আলোচিত অতি বুদ্ধিমতী ও মতামতের অধিকারিনী মহিলা আন নাওয়ার বিন্‌ত মালিক (রা) ও তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) হিজরত করে মাদিনায় আসার পর আন-নাওয়ার (রা)- এর বড় ছেলে যায়দ (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ১১ বছর। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন তাকে ইহুদিদের লেখা পড়তে-লিখতে শেখার নির্দেশ দেন যাতে তিনি তাদের

---

১. আত-তাবাকাত-৮/৪১৯; উসুদুল গাবা-৫/৫৫৭

বহু পুস্তক পড়ে শোনাতে পারেন। তিনি বলেন, কারণ আমি তাদের কাউকে বিশ্বস্ত মনে করি না।

তিনে সে লেখা শেখেন এবং একজন দক্ষ লেখক হিসেবে গড়ে ওঠেন। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়া সাল্লাম যখন ইহুদিদের নিকট কোন কিছু লিখে পাঠানোর প্রয়োজন মনে করতেন তখন সে লেখার দায়িত্বটি এই জায়েদ (রা)-ই পালন করতেন।[২]

আন-নাওয়ার (রা)-এর দ্বিতীয় স্বামী আম্মার ইবনে হায্ম রা-এর জীবন সম্পর্কে কিছু কথা জানা থাকা প্রয়োজন। তিনি ছিলেন মাদিনার বানু নাজ্জার গোত্রের একজন সাহাবী। মাক্কার 'আল আকাবা'র রাতে রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বায়াতকারী মাদিনা থেকে আগত ৭০ জন পুরুষ সাহাবীদের একজন ছিলেন তিনি।

তিনি বদর, ওহুদ, খন্দকসহ সকল যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা) এর সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। মাক্কা বিজয়ের দিন বানু নাজ্জারের পতাকাটি তাঁর হাতেই ছিল।

রিদ্দাহ্ তথা ধর্ম ত্যাগকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি খালিদ ইবনে আল ওয়ালীদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন এবং ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। সেটা ছিল হিজরী বার (১২) সন।[৩]

আন-নাওয়ার (রা)-এর রাসূলুল্লাহ (সা) কে প্রদত্ত প্রথম হাদিয়া

রাসূলুল্লাহ (সা) মাদিনায় এসে আবু আইয়ুব আনসারীর বাড়িতে অতিথি হিসেবে অবস্থান করেন। বিভিন্ন ব্যক্তি ও বাড়ি থেকে খাদ্য-খাবার হাদিয়া হিসেবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসতে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট হাদিয়া হিসেবে আসা প্রথম খাদ্য পাত্রটি ছিল আন-নাওয়ার (রা)-এর। এ সম্পর্কে তাঁর ছেলে যায়দ (রা) বলেন, ঘিয়ে ভাজা রুটি ও দুধে ভরা একপাত্র খাবারসহ আমার মা আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট পাঠান। আমি পাত্রটি রাসূলুল্লাহ (সা) এর সামনে রেখে বলি ইয়া রাসূলুাল্লাহ। এই পাত্রটি সহ আমার মা আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

بَارَكَ اللهُ فِيْكَ وفِيْ أمِّكَ

'আল্লাহ তোমাদের মধ্যে এবং তোমার মায়ের মধ্যে বরকত দিন।'

তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) পাশে উপস্থিত সাহাবীদের ডাকেন, তাঁরা সবাই সে খাবার খান।'[৪]

এরপর আবু আইয়ুব (রা) এর বাড়িতে অসংখ্য খাবার ভর্তি পাত্র রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসতে থাকে। তবে আন-নাওয়ার (রা) প্রেরিত তাঁর ছেলের পাত্রটি সবার অগ্রগামীতা লাভ করে।

২. নিসাউ মিন 'আসরি আন-নুবুওয়াতি-১৯৯
৩. আত-তাবাকাত-৩/৪৮৬; উসুদুল গাবা-৪/৪৮
৪. আস-সীরাতু আল-হালাবিয়্যাহ-২/২৭৭

আন-নাওয়ার (রা) ও মুআজ্জিনুর রাসূল (সা)

আন-নাওয়ার (রা)-এর বাড়িটি ছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাসজিদের পাশে। বেলাল (রা) ঘরটির দেওয়াল একটু উঁচু করেন এবং সেটির উপর দাঁড়িয়ে আযান দিতেন। আন-নাওয়ার (রা) বলেন, আমার বাড়িটি ছিল মসজিদের পাশে লম্বা লম্বি বাড়ি। বেলাল (রা) প্রথম যখন আযান দিতেন এই বাড়ির উপর দাঁড়িয়ে আযান দিতেন। পরে রাসূলুল্লাহ (সা) মাসজিদ তৈরি করলে সেটির আঙ্গিনায় আযান দিতেন। তবে আন-নাওয়ার (রা)-এর জন্য সর্বোচ্চ সম্মানজনক বিষয় এই যে, আযান প্রচলনের সূচনাপর্বে তার বাড়িটিকে মিনার হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

আন-নাওয়ার বিন্ত মালিক (রা) মাদিনার আনসারী মহিলা সমাজে অতি উঁচু মর্যাদার অধিকারিনী ছিলেন। তাঁর ছেলে জায়দ (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অতি প্রিয় পাত্র। খুলাফায়ে রাশেদিন বিশেষত আবু বকর সিদ্দিক (রা) এর নিকট তাঁর বিশেষ মর্যাদা ছিল। তিনি তাঁর প্রশংসায় বলেন, একজন বুদ্ধিমান মানুষ। তাই তিনি তাঁকে আল কোরআন সংগ্রহের দায়িত্বে নিয়োগ করেন। তিনি এই মহা দায়িত্ব অতি সার্থকভাবে পালন করেন। আল্লাহর রাসূল (সা) তাঁর মা ও তাঁর জন্য যে দু'আ করেছিলেন তা যে কবুল হয়েছে তা তাদের জীবন কথা পাঠ করলে বুঝা যায়।

আন-নাওয়ার (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) হাদিস বর্ণনা করেছেন আর তার সূত্রে বর্ণনা করেছেন উম্মু সাদ ইবনে আস 'আদ ইবন যুরারাহ (রা)।[৫]

আন-নাওয়ার (রা)-এর মৃত্যু সম্পর্কে সিরাত বিশেষজ্ঞগণ তেমন কিছু উল্লেখ করেননি। তবে তিনি তাঁর ছেলে জায়দ (রা)-এর জীবদ্দশায় ইন্তেকাল করেন এবং ছেলে তাঁর সালাতুল জানাযা আদায় করেন। হিজরী ৪৫ সনে ছেলে যায়দ (রা) ইন্তেকাল করেন।[৬]

আর- রুবায়'উ বিন্ত আন-নাদর আল-আনসারিয়্যাহ্ (রা)

আর-রুবায়'উ বিন্ত আন-নাদর (রা) মাদীনার খাযরাজ গোত্রের একজন মহিলা সাহাবী। তিনি প্রখ্যাত সাহাবী আনাস ইবন আন-নাদর (রা)-এর বোন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) এর খাদিম প্রখ্যাত সাহাবী আনাস ইবন মালিক (রা)-এর ফুফু। আর-রুবায়'উ (রা) ছিলেন বানু নাজ্জার গোত্রের সুরাকা ইবন আল-হারিছ-এর স্ত্রী। তাঁরই ঔরসে পুত্র হারিছার জন্ম হয়। আর তার নামেই তাঁর উপর কুনিয়াত বা ডাকনাম হয়-উম্মু হারিছা। উম্মু হাকীম নামে আর-রুবায়'উ (রা) এর একজন বোন ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ (সা) এর হাতে বায়'আত করেন। উল্লেখ্য যে, আর-রুবায়'উ নামে দু'জন মহিলা সাহাবীর নাম পাওয়া যায়। যেমন: আর-রুরায়'উ বিন্ত আন-নাদার

---

৫. আল-ইসতী'আব-৮/৪২০; উসুদুল গাবা-৫/৫৫৭

৬. নিসাউ মিন 'আসরি আন-নুবুওয়াতি-২০১

(রা) ও আর- রুবায়'উ বিনত মু'আওবিয (রা)।[৭]

আর-রুবায়'উ (রা) সেই সব মহিলাদের একজন যাঁদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন সম্মানিত করেছেন এবং পরকালীন জীবনে সর্বোত্তম আবাসন দান করেছেন। তিনি তাঁর ছেলে-মেয়েকে অতি উত্তম শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তোলেন। তিনি তাঁর ছেলেকে এমনভাবে গড়ে তোলেন যাতে সে ভবিষ্যতে সত্যের সৈনিকদের একজন হতে পারে। তাঁর মধ্যে নাবী প্রেম ও আল্লাহর পথে শহীদ হবার কামনা সৃষ্টি করেন। একদিন ছেলে হারিছা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করেন ঃ

হারিছা! আজ তোমার সকাল কেটেছে কেমন? হারিছা জবাব দেন: আল্লাহর ওপর একজন সত্যিকার মু'মিন হিসেবে আমার সকাল কেটেছে।

রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে বলেন ঃ তুমি যা বলছো, তা একটু ভেবে দেখো। কারণ, প্রত্যেকটি কথারই রয়েছে একটি বাস্তবতা।

হারিছা (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার অন্তর, দুনিয়া বিমুখ হয়ে গেছে, তাই আমার রাত কেটেছে জাগ্রত অবস্থায়। আর দিন কাটে তৃষ্ণার্ত অবস্থায়। আমি যেন আল্লাহর আরশের চারপাশে ঘোরাঘুরি করি, আমি আরো দেখতে পাই জান্নাতবাসীরা পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ করছে, আর জাহান্নামবাসীরা পরস্পর সাহায্য-সহযোগিতা কামনা করছে।

রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন: তুমি যা দেখেছো, তা সঠিক দেখেছো। শক্তভাবে তা ধরে রাখো। তুমি একজন বান্দা। অর্থাৎ তুমি এমন একজন বান্দা, আল্লাহ যার অন্তরে ঈমানের বীজ রোপন করে দিয়েছেন।

হারিছা (রা) তখন বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার শাহাদাতের মর্যাদা লাভের জন্য আপনি আল্লাহর কাছে দু'আ করুন।[৮] রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর মনো বাসনা পূরণের জন্য দু'আ করেন। হিজরী দ্বিতীয় সনে বদর যুদ্ধ হয়। হারিছা (রা) তাঁর মায়ের দু'আ নিয়ে যুদ্ধের ময়দানের দিকে বেরিয়ে পড়েন। যুদ্ধ শুরু হলে তিনি শত্রুবাহিনীর হাতে শাহাদাত বরণ করেন। মায়ের দু'আ, আর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সেই দু'আ বাস্তব রূপ লাভ করে।

ইবন ইসহাক (রহ) বলেন ঃ বদর যুদ্ধে মুসলিম সৈনিকদের মধ্য থেকে প্রথম শহীদ হন উমার ইবন আল-খাত্তাব (রা)-এর অযাদকৃত দাস-মিহজা'। শুক্র বাহিনীর নিক্ষিপ্ত তীরের আঘাতে তিনি শহীদ হন। তারপর শত্রুবাহিনীর নিক্ষিপ্ত আর একটি তীর এসে হারিছা (রা)-এর বুকে বিদ্ধ হয় এবং তিনি শহীদ হন।[৯]

উম্মু হারিছা ও তাঁর মেয়ে তখন মাদীনার অবস্থান করছিলেন। তাদের নিকট হারিছার

---

৭. আল-ইসাবা-৪/২৯৪; তাহযীব আল-আসমা'-ওয়াল লুগাত-২/২৪৪, নিসাউমিন 'আসরি অন-নুবুওয়াতি-১৭৮

৮. আস-সীরাতু আল-হালাবিয়্যাহ-২/৪০৫

৯. নিসাউ হাওলার রাসূল-১৭৯; উসুদুল গাবা-৪/৪২৪

(রা) শাহাদাত লাভের খবর পৌঁছালে মা রুবায়'উ (রা) বলেন: 'আল্লাহর কসম! আমি তার জন্য কান্নাকাটি করবো না। রাসূলুল্লাহ (সা) আসুন। তারপর আমি হারিছার (রা) পরিণতি সম্পর্কে তাঁর নিকট জানতে চাইবো। যদি আমার ছেলে জান্নাতবাসী হয়, তাহলে আমি তার জন্য কাঁদবো না, সবর করবো এবং মূল্যায়ন করবো। আর যদি সে জাহান্নামী হয়, তাহলে কাঁদবো।

বিজয়ীর বেশে নাবী (সা) বদর থেকে ফিরলেন। উম্মু হারিছা (রা) তাঁর নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! হারিছা সম্পর্কে আপনি আমাকে কিছু বলবেন না?

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন: উম্মু হারিছা! জান্নাতের বহু শাখা-প্রশাখা আছে। তোমার ছেলে সর্বোচ্চ স্তরের 'জান্নাতুল ফিরদাউস' লাভ করেছে।

উম্মু হারিছা (রা) হাসতে হাসতে একটু পেছন দিকে সরে আসেন। আর বলতে থাকেন ঃ হে হারিছা! তোমার জন্য শুভ সংবাদ, তোমার জন্য শুভ সংবাদ। অতঃপর রাসূল (সা) এক পাত্র পানি আনতে বলেন। তিনি সেই পানি দিয়ে হাত ধোন ও কুলি করেন। তারপর উম্মু হারিছা (রা) সেই পানির কিছু পান করেন এবং তার মেয়েকে পান করান। তারপর রাসূল (সা) সেই পাত্রে পানি ভরে সংগে নিয়ে যাবার জন্য বলেন। এই ঘটনার পর তিনি মাদীনার সকল মহিলারা শ্রদ্ধার পাত্রতে পরিণত হন। তাঁর ধৈর্য্য ও শক্ত ঈমান দুনিয়ার মুসলিম মহিলাদের জন্য চিরকাল আদর্শ হয়ে থাকবে।

জীবনের এক পর্যায়ে একবার উম্মু হারিছা আর-রুবায়'উ ও তাঁর প্রতিবেশী এক আনসারী মহিলার মধ্যে ঝগড়া হয়। রুবায়উ' (রা) সেই মহিলার একটি দাঁত ভেঙ্গে দেন। সেই মহিলার পরিবারের লোকেরা এর কিসাস বা বদলা দাবি করেন। রুবায়'উর পরিবারের লোকেরা তাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন; কিন্তু তারা তা মানতে অস্বীকার করেন। অতঃপর উভয় পক্ষ নাবী (সা)-এর নিকট এসে বিষয়টি তাঁকে অবহিত করেন। নাবী (সা) কিসাস-এর নির্দেশ দেন।

তখন রুবায়'উ (রা)-এর ভাই আনাস ইবন নাদর (রা) উঠে দাঁড়িয়ে বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! রুবায়উ-র দাঁত ভেঙ্গে ফেলা হবে? না। যিনি আপনাকে সত্যসহকারে পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ! তার দাঁত ভাঙ্গা হবে না।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা উভয়পক্ষের অন্তরসমূহে ইলহাম জারি করেন। ফলে তারা একে অপরকে ক্ষমা করে মিটমাট করে নেয়। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ

আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা আল্লাহর নামে কোনো ব্যাপারে কসম খেলে আল্লাহ তা পূরণ করেন। আনাস ইবন আন-নাদার হলো তাদের একজন।[১০] রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট রুবায়'উ (রা) এর স্থান ও মর্যাদা কোন স্তরে ছিলো তা- এ ঘটনা দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায়।

---

১০. আল-ইসাবা-৪/২৯৪; উসুদুল গাবা-৫/৪৫২

রুবায়'উ (রা)-এর ভাই আনাস ইবন আন-নাদার (রা) কোনো কারণে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেননি। এতে তিনি ভীষণ ব্যথিত হন। তিনি বলেনঃ প্রথম যুদ্ধ যাতে রাসূলুল্লাহ (সা) অংশ গ্রহণ করেছেন; কিন্তু আমি অনুস্থিত থেকেছি। এরপরে আল্লাহ যদি আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে অন্য কোনো যুদ্ধে অংশ গ্রহণের সুযোগ দেন, তাহলে আমি কী করবো, আল্লাহ তা দেখিয়ে দেবেন।

তিনি যা ইচ্ছা করেছেন, বাস্তবে তা পরিণত হয়েছে।

আনাস ইবন মালিক (রা) বলেছেন: আনাস ইবন আন-নাদার (রা) উহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে অংশ গ্রহণ করেন। যুদ্ধ শুরুর পূর্বে সা'দ ইবন মু'আয (রা) তাঁকে স্বাগতম জানান। তখন আনাস ইবন আন-নাদার (রা) বলেন : ওহে আবূ 'আমর অর্থাৎ সা'দ, তুমি এখন কোথায়? কী বিস্ময়কর ব্যাপার! আমি তো উহুদের দিক থেকে আসা জান্নাতের সুগন্ধি অনুভব করছি! যুদ্ধ শুরু হলো এবং তিনি শাহাদাত লাভ করেন। যুদ্ধ শেষে তাঁর দেহে আশিটিরও বেশি তীর, বর্শা ও তরবারির আঘাতের চিহ্ন দেখা যায়। দেহ এতো ক্ষত-বিক্ষত হয় যে, তাঁর বোন রুবায়'উ বিনত নাদার (রা) বলেন : আমি কেবল তার একটি আঙ্গুল দেখেই তাকে চিনতে পারি। তখন নিম্নের এ আয়াতটি তাঁর ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের শানে নাযিল হয় :[১১]

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَال صَدَقُواْ مَا عَٰهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُۥ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُۖ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلا.

উম্মু হারিছা রুবায়'উ (রা) ছিলেন ও পৃথিবীতে ধৈর্য্য, সহনশীলতা ও অঙ্গীকার পূর্ণকারিণী মহিলাদের অগ্রপথিক। সবশেষে আল্লাহর নিকট আমাদের আবেদন হলো, তিনি যেন উম্মু হারিছা রুবায়'উ (রা)-কে জান্নাতবাসিনী করেন এবং তাঁর ছেলের সংগে জান্নাতুল ফিরদাউসে অবস্থানের সুযোগ দান করেন।[১২]

উম্মুল হাকাম বিন্ত আবী সুফইয়ান (রা)

উম্মুল হাকাম বিন্ত আবী সুফইয়ান (রা) হলেন মাক্কার কুরায়শ গোত্রের বানু উমাইয়্যা শাখার মেয়ে। রাসূলুল্লাহ (সা) এর নেতৃত্বে যে দিন মাক্কা বিজিত হয়, সেদিন সেখানকার মহতী মহিলাগণ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতে বায়'আত করে মুসলিম হন, তিনি ছিলেন তার একজন। তাঁর পিতা আবু সুফইয়ান ও মাতা হিন্দা উভয়ে ছিলেন মাক্কা বিজয়ের দিন পর্যন্ত ইসলাম ও মুসিলমদের চরম শত্রু। রাসূলুল্লাহ (সা) বিনা রক্তপাতে কেবল মাক্কার ভূমিই জয় করেননি, বরং সেখানকার রাসূলুল্লাহর পরম শত্রু ও ইসলাম বিদ্বেষী নারী-পুরুষদের অন্তরও জয় করেন। সেদিন সুফইয়ান (রা)-এর

---

১১. তাফসীরু ইবনর কাছীর; সুরাতুল আহযাব, আয়াত-২৩; আল-ইসাবা-৪/২৯৪

১২. নিসাউ মিন 'আসরি আন-নুবুওয়াতি-১৮২

পরিবারের সকলে মুসলিম হন। যেমন আবু সুফইয়ান (রা) নিজে, স্ত্রী হিন্দা এবং তার ছেলে ও মেয়েরা। তাঁদের মধ্যে হাকামও ছিলেন। উম্মুল মু'মিনীন উম্মু হাবীবা (রা) বিন্ত আবী সুফইয়ান (রা) উম্মুল হাকাম-এর বৈমাত্রীয় বোন। আর মু'আবিয়া ইবন আবী সুফইয়ান (রা) হলেন তাঁর মাতৃসহোদর ভাই। তাঁদের দু'জনেরই মা হলেন হিন্দা বিনত উতবা (রা)। ইবন আসাকির (রহ) বলেনঃ উম্মুল হাকাম (রা) নাবী (সা)-কে লাভ করেন এবং মাক্কা বিজয়ের দিনই যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বায়'আত করেন, তিনি ছিলেন তাঁদের একজন। উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এর কথার মাধ্যমে মহিলাদের বায়'আত করতেন। পুরুষদের সাথে যেভাবে হাত মেলাতেন, সেভাবে নারীদের সাথে কক্ষণো হাত মেলাতেন না। একমাত্র মাহরাম মহিলা এবং আল্লাহ যে নারীকে তাঁর জন্য হালাল করেছেনে, তাঁরা ছাড়া আর কোনো নারীকে কক্ষনো সম্পর্শ করেননি।[১৩]

মাক্কা বিজয়ের দিন আবু বাকর আস-সিদ্দীক (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবু সুফইয়ান এমন এক ব্যক্তি যে নিজের সুনাম-সুখ্যাতি ও সম্মান-মর্যাদা পসন্দ করে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) ঘোষণা দেন :

من دخل دار أبي سفيان فهوا من

'কেউ আবু সুফইয়ানের বাড়িতে প্রবেশ করলে, সে নিরাপত্তা লাভ করবে।' একথা উম্মুল হাকাম (রা)-এর কানে গেলে নিজেকে নিরাপদ বোধ করলেন।[১৪] ।

শয়তান আবূ সুফইয়ান (রা) কে দীর্ঘ দিন পরিচালিত করার পর তিনি তার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের সেই দৃশ্যটি আমাদের জন্য চমকপ্রদ। আর তা হলো, মাক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) তাওয়াফ শেষ করে কা'বার অভ্যন্তর থেকে বের হন। তখম আবূ সুফইয়ান (রা) মাসজিদে বসা ছিলেন। আবু সুফইয়ান (রা) মনে মনে বললেনঃ আমি জানিনা, মুহাম্মদ (সা) আমাদেরকে কীভাবে পরাজিত করলো? তারপর রাসূল (সা) তার দিকে এগিয়ে তাঁর বুকে মৃদু আঘাত করে বলেনঃ আল্লাহর সাহায্যে আমরা তোমাকে পরাভূত করবো। আবু সুফইয়ান সাথে সাথে বলে ওঠেন:

أشهد أنك رسول الله

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি আল্লাহর রাসূল।'

ইবনু আব্বাসের (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, আবু সুফইয়ান দেখেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) হাঁটছেন, আর তার পেছনে মানুষ তাঁকে অনুসরণ করে চলছে। তিনি মনে মনে

---

১৩. আল ইসাবা, জীবনী নং ১২১৬; উসুদুল গাবা-৬/৩২০; জীবনী নং ৭৪০৯; আ'লাম আন-নিসা ১/২৭৯; আল-'ইক্‌দ আল ফারীদ-৬/১৩০

১৪. বানাত আস্ সাহাবা-১১১

বললেন! যদি আমি এই লোকটির সাথে যুদ্ধে জড়াতে পারতাম! একটু পরেই রাসূল (সা) তাঁর পাশে এসে পড়েন এবং তাঁর বুকে মৃদু আঘাত করে. বলেন: 'তাহলে আল্লাহ, তোমাকে লাঞ্ছিত করবেন।' আবু সুফইয়ান সাথে সাথে বলে ওঠেন:

'আমি আল্লাহর কাছে তাওবা করছি এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। এই মূহূর্তের পূর্ব পর্যন্ত আমি বিশ্বাস করিনি যে, আপনি অবশ্যই একজন নাবী। আমি অবশ্যই একথাটি আমার অন্তরকে বলবো।[১৫] এ ভাবে আবু সুফইয়ানের অন্তরে, ঈমান বদ্ধমূল ধারণ করে।

উম্মুল হাকাম এসব ঘটনার সবকিছুই জানতে পারেন। কিন্তু কুরায়শদের অতি বুদ্ধিমতি মহিলা যিনি তাঁর মা, তাঁর ভূমিকা তখন কী ছিলো? এসব ঘটনার পর হিন্দা দ্রুত তার বাড়ির দিকে ছুটে যান এবং তাঁর বাড়িতে থাকা মূর্তিটিকে পা দিয়ে লাথি মারতে মারতে বলতে থাকেনঃ 'আমরা তোর ব্যাপারে ঘোর বিভ্রান্তিতে ছিলাম।' এভাবে হিন্দা বায়'আতকারিনী ঈমানদার মহিলাদের তালিকায় নিজের নামটি অন্তর্ভুক্ত করেন।[১৬]

বৈবাহিক জীবন:

আবু সুফইয়ান (রা)-এর কন্যা উম্মুল হাকাম-এর প্রথম স্বামী ছিলেন আয়্যাদ ইবন গানাম আল-ফিহরী।[১৭] তিনি ছিলেন একজন উঁচু স্তরের সম্মানীত সাহাবী। তিনি হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। হুদায়বিয়াতে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সংগে ছিলেন। তিনি তার গোত্রে একজন অতি উঁচু মর্যাদাবান ও দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁর গোত্রের ব্যবসার উদ্দেশ্যে বা অন্য কোনো কারণে ভ্রমনকারীদের পানাহারের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিতেন। এ কারণে তাকে 'যাদুর রাকিব'- অর্থাৎ আরোহীদের পাথেয় বলা হতো। পথ চলাকালীন সময়ে সংগে নেয়া খাদ্য-খাবার শেষ হয়ে গেলে নিজের বাহন উটটি জবেহ করে সবাইকে খাওয়াতেন।

'আয়্যাদ (রা) ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাহিনীর তালিকায় নিজের নামটি ঢুকিয়ে দেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী উম্মুল হাকাম ঈমান আনলেন না। তিনি শিরক তথা অংশীবাদিতার ওপর অটল থাকেন। কিন্তু যখন আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন এরূপ জীবনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এ আয়াত নাযিল করেন।[১৮]

وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ

'তোমরা কাফিরদের মতে সাথে সম্পর্ক আঁকড়ে ধরে থেকো না'- তখন 'আয়্যাদ (রা) বিষয়টি উপলব্ধি করেন। তিনি কাফির স্ত্রী উম্মুল হাকামকে তালাক দেন। তাঁদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবার পর পিতা আবু সুফইয়ান (রা) ছাকাফী গোত্রের আবদুল্লাহ ইবন

---

১৫. প্রাগুপ্ত
১৬. প্রাগুপ্ত-১১২
১৭. আল ইসতী'আব-৯/৭০
১৮. সূরা আল মুনতাহিনা-১০

উসমানের সাথে উম্মুল হাকামকে বিয়ে দেন। যিনি ইতিহাসে ইবনু উম্মিল হাকাম-উম্মুল হাকাম-এর ছেলে নামে পরিচিত।

অতঃপর সেই মহা মাক্কা বিজয়ের দিন এসে যায়। সেই সুযোগে উম্মুল হাকাম ঈমান এনে রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট বায়'আতকারিনী সাহাবীদের তালিকায় নিজের নামটি লিখে ফেলেন।[১৯]

উম্মুল হাকাম (রা)-এর ছেলে আব্দুর রহমানকে তাঁর মামা মু'আবিয়া (রা) হিজরী ৫৮ সনে কুফার ওয়ালী নিয়োগ করেন, কিন্তু তেমন সফলতা দেখাতে পারেননি। মামা তাকে বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োগ দিয়ে পরীক্ষা করেন, কিন্তু সফল হতে পারেননি। তাই মু'আবিয়া (রা) তাকে অপসারণ করেন।

উম্মুল হাকাম (রা) তাঁর ভাই মু'আবিয়া (রা)-কে তাঁর একটি মেয়েকে আবদুর রহমানের সাথে বিয়ে দেয়ার প্রস্তাব করেন। মু'আবিয়া (রা) বলেন, সে বংশগত মর্যাদার দিক দিয়ে আমার কোন মেয়ের সমপর্যায়ের নয়। উম্মুল হাকাম (রা) বলেন, আমার আব্বা আবু সুফিয়ান (রা) আমাকে তাঁর পিতার সাথে বিয়ে দিয়েছেন। বংশগত মর্যাদা সম পর্যায়ের না হলে তিনি তা কিভাবে করেছেন? কারণ তিনি তখন কিছু কিসমিস পছন্দ করতেন; কিন্তু এখন কিসমিস তো আমাদের নিকট পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে।

এ ঘটনা দুই ভাই-বোন মু'আবিয়া ও উম্মুল হাকাম-এর সম্পর্কের মধ্যে একটু দুর্বলতা সৃষ্টি করতে পারেনি। আবদুর রহমান বলেন, আমার মা উম্মুল হাকাম (রা) আমাকে বলেছেন, তাঁর ভাই মু'আবিয়া (রা) যখন একবার সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন তখন তিনি তার পাশে ছিলেন। শেষ জীবনে তিনি শামের দিমাশ্ক শহরে বসবাস করেছেন। সেখানে বসবাসকারিনী যে সকল মহিলা হাদিস বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে উম্মুল হাকাম (রা) এর নামটিও দেখা যায়।

তিনি কখন এবং কোথায় ইন্তেকাল করেন তা সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায় না। তবে হিজরি ৬০ সনে তাঁর ভাই মু'আবিয়া (রা) মৃত্যুবরণ করেন। তখন তিনি ভাইয়ের শয্যা পাশে উপস্থিত ছিলেন। সে কথা তিনি বর্ণনা করেছেন। এর দ্বারা বুঝা যায়, তিনি হিজরী ৬০ সনের পর মৃত্যুবরণ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা উম্মুল হাকাম, তার পিতা-মাতা ও ভাই সবার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন আমরা এই কামনা করি। ■

---

১৯. বানাত আস সাহাবা-১১৭

নতুন প্রকাশিত হলো-

ইসলামী অর্থব্যবস্থার মৌলিক ধারণা

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০

ফোন ঃ ০১৬১২৯৫৩৬৭০, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০

৩৪/১ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০

ফোন: ০১৭৪১৬৭৭৩৯৯

Web: www. dhakabic.com,

E-mail : dhakabic@gmail.com

৩৪ নং পৃষ্ঠায়

আবাবিল বিজ্ঞাপন

আল্ কুরআন সম্পর্কে কতিপয় জরুরী জ্ঞাতব্য বিষয়

ড. মোঃ ছামিউল হক ফারুকী

আল কুরআন রাজাধিরাজ মহান আল্লাহর পক্ষ হতে বান্দাদের জন্য এক রাজকীয় ফরমান, এক নির্ভুল জীবন বিধান এবং সত্য ও সঠিক পথের এক অনন্য নির্দেশিকা। সে জন্য প্রত্যেক মুসলিমের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এর বিধান ও নির্দেশিকা মেনে চলা অত্যাবশ্যক। এজন্য আল কুরআন পড়া ও বুঝা খুবই জরুরী।

বিশ্বের সর্বাধিক পঠিত, শ্রুত ও অনুসৃত গ্রন্থ আল কুরআন। নাযিলের সময় থেকে এ পর্যন্ত আল্ কুরআনের বাণী ও মর্ম মানুষের নিকট পৌঁছানো ও বুঝানোর জন্য নানাবিধ প্রচেষ্টা চলে আসছে। আল্ কুরআনের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন ধরনের তাফসীর লিখে কুরআনের ব্যাখ্যা করেছেন, যেগুলো আল্ কুরআনের মূল বাণী বুঝার জন্য বেশ সহায়ক। যারা আল্ কুরআন বুঝতে আগ্রহী তারা এ সকল তাফসীরের সাহায্য নিয়ে তা বুঝার চেষ্টা করে থাকেন।

কিন্তু আল্ কুরআন যেহেতু মানুষের রচিত গ্রন্থ নয়। সেহেতু পাঠক এটি পাঠ করতে এসে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হন। এজন্য কুরআন পাঠের পূর্বে পাঠককে কুরআন সম্পর্কে কিছু ধারণা লাভ করা প্রয়োজন।

আল কুরআন কোন্ ধরনের গ্রন্থ

আল কুরআন ভিন্নধর্মী ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমন্ডিত একটি গ্রন্থ। এটি সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ হতে নাযিল করা কিতাব। এটি মানুষের তৈরী অন্যান্য পুস্তকের মত নয়। তাই এটি পাঠকালে অন্যান্য পুস্তকের মত মনে করে বই পুস্তক পাঠ করার প্রচলিত মানসিকতা ও পদ্ধতিতে পাঠ করতে গিয়ে পাঠককে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কারণ অন্যান্য গ্রন্থ লিখিত হয় বিষয়ভিত্তিক, গ্রন্থটির নামও হয় বিষয় ভিত্তিক। গ্রন্থের একটি ভূমিকা থাকে, যেখানে গ্রন্থের মূল বক্তব্য ও সারমর্ম এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা দেওয়া থাকে। বিষয়ের ক্রমানুসারে অধ্যায়, পরিচ্ছেদ ইত্যাদি থাকে এবং সেগুলোর শিরোনামও থাকে। তাছাড়াও থাকে বিষয়ভিত্তিক সূচীপত্র। কিন্তু আল কুরআন এধরনের লিখিত কোনো গ্রন্থ নয়। বরং এটি প্রচলিত গ্রন্থের চেয়ে একেবারেই অভিনব পদ্ধতিতে উত্থাপিত হয়েছে। এটি মানুষের জন্য জীবন বিধান হিসেবে নাযিল করা হয়েছে। কিন্তু এটি প্রচলিত সংবিধানের মতও নয়, বরং এটি সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী একটি গাইড বুক যাতে মানব জীবনের সাথে সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ের হিদায়াত বা নির্দেশিকা রয়েছে। এ কিতাবে আলোচিত হয়েছে আকীদা-বিশ্বাস, শর'ঈ ও নৈতিক বিধি-বিধান, দা'ওয়াত, সতর্ক বাণী ও উপদেশ, ভীতি প্রদর্শন ও সুসংবাদ, বিভিন্ন বিষয়ের যুক্তি প্রমাণ, সমালোচনা-পর্যালোচনা নিন্দা-

তিরস্কার ও পুরস্কার, ঐতিহাসিক বিভিন্ন ঘটনার বিবরণ, উপমা ও দৃষ্টান্ত পেশ প্রভৃতি। দ্বিতীয়তঃ এ কিতাব কোনো অভিসন্দর্ভ, প্রবন্ধ বা গ্রন্থাকারে নাযিল হয়নি বরং নাযিল হয়েছে বক্তৃতা বা ভাষণ আকারে। এজন্য এখানে গ্রন্থের নিয়ম অনুসরণ না করে বক্তৃতার রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। সে বক্তৃতা বা ভাষণও পেশ করা হয়েছে একজন দা'ঈ বা আল্লাহর পথে আহবানকারীর ভাষণ আকারে,

অত্যন্ত প্রভাব বিস্তারকারী এবং মানুষের মন-মগয, বিবেক-বুদ্ধি এবং ঝোক প্রবণতা পভৃতির প্রতি দারুণ আবেদন সৃষ্টিকারী। এটি মানব জাতির জন্য পথ প্রদর্শক গ্রন্থ, যা মানুষের নিকট পৌঁছাননোর জন্য মহান আল্লাহ তাঁর সর্বশেষ নাবী মুহাম্মাদ (সা.) কে প্রেরণ করেছেন এবং হুকুম দিয়েছেন যে, নিজের পরিমন্ডল ও নিজের গোত্র থেকে এর দাও'আত শুরু করে ক্রমান্বয়ে সকল মানুষের নিকট তা পৌঁছাতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রথমে অনেকটা নীরবে নিজস্ব পরিসরে এ দাও'আতের সূচনা করেন। চার-পাঁচ বছর পর্যন্ত এ দাও'আত তেমন কঠিন কোনো বাঁধার সম্মুখীন হয়নি। কিন্তু যতই দিন যেতে থাকে এবং এ দাও'আত যতই সম্প্রসারিত হতে থাকে, ক্রমেই তা বাঁধার সম্মুখীন হতে থাকে। সে বাঁধা ক্রমান্বয়ে কঠোর থেকে কঠোরতর হতে থাকে এবং দাও'আত গ্রহণকারীদের উপর জুলুম নির্যাতন নেমে আসতে থাকে এবং এক পর্যায়ে তা চরম আকার ধারন করে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর নির্দেশে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.) ও তাঁর অনুসারীগণ তাদের নিজ দেশ মক্কা ত্যাগ করে মদিনায় হিজরত করতে বাধ্য হন। হিজরাতের পূর্বেই মদিনাতে ইসলামের ব্যাপক প্রসার ঘটে, যার ফলে হিজরাতের পর পরই মদিনায় তিনি একটি ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন। কিন্তু মক্কার কুরাইশগণ মদিনাতেও মুসলিমদেরকে স্বস্তিতে থাকতে দেয়নি। বরং তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও বিরোধিতা আরো জোরদার করেছে। যার কারণে আল্লাহর রাসূল (সা.) এবং তাঁর সাথীদেরকে বেশ কয়েকটি যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়েছে। দীর্ঘ দ্বন্দ সংঘাত পেরিয়ে পরিশেষে মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে ইসলাম গোটা আরব জাহানে একচ্ছত্র প্রতিপত্তি লাভে সমর্থ হয়। এর ফলে গোটা আরবে আল কুরআনের অনুশাসন চালু হয় ও তার আলোকে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালিত হতে থাকে এবং ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য আন্তর্জাতিক দুনিয়ার পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। আল কুরআন যে দাও'আত নিয়ে নাযিল হতে শুরু করে, তা পরিপূর্ণতায় পৌঁছতে ২৩ বছর সময় লেগেছে। এর বিভিন্ন স্তরে মহান আল্লাহ প্রয়োজন ও প্রেক্ষিতের আলোকে উপযোগী নির্দেশিকাসহ কুরআনের বিভিন্ন অংশ নাযিল করেছেন। কুআনের যে অংশ যখন নাযিল হতো, নাবী (সা.) সাথে সাথেই তা কাতেবে ওহী বা ওহী লেখকদের দ্বারা লিখে রাখার ব্যবস্থা করতেন। কোন্ অংশ কোথায় লিখতে হবে তাও তিনি সাথে সাথে বলে দিতেন। এ ভাবে আল কুরআন নাযিলের সাথে সাথে এর ক্রমবিন্যাসও ঠিক করে দেওয়া হয়। এ ক্রমবিন্যাস স্বয়ং নাবী (সা.) ঠিক করে দেন এবং আল্লাহর ইশারাতেই

তিনি তা করে দেন। আল কুরআন যখন গ্রন্থাকারে সংকলন করা হয় তখন এ ক্রমবিন্যাস অনুযায়ীই সংকলন করা হয়।

আল-কুরআন গ্রন্থাকারে সংকলনের ইতিহাস:

বর্তমানে আমাদের নিকট আল কুরআন গ্রন্থাকারে রয়েছে। কিন্তু আল কুরআন গ্রন্থাকারে নাযিল হয়নি। বরং রাসূলুল্লাহ (সা) এর নবুওয়্যাতের ২৩ বছরে বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে কিছু কিছু করে নাযিল হয়েছে। পরবর্তীকালে এটিকে সংকলন করে গ্রন্থাবদ্ধ করা হয়েছে।

মূলত: আল কুরআন একত্রিতকরণ, সংকলন ও সংরক্ষণের দায়িত্ব মহান আল্লাহ নিজেই নিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

"নিশ্চয়ই আমি যিকর (কুরআন) নাযিল করেছি এবং অবশ্যই এর সংরক্ষক ও আমি।"[১]

আল্লাহ আরো বলেন,

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

"দ্রুত কুরআন মুখস্ত করার জন্য (হে নবী) তোমার জিহ্বাকে নাড়াচাড়া করিও না। এর একত্রিতকরণ এবং পাঠ করিয়ে দেওয়া আমার দায়িত্ব।"[২]

আল কুরআনের যখন যে অংশ নাযিল হতো, নাবী (সা) সাথে সাথে তা ওহী লেখকদের দ্বারা লিখে রাখার ব্যবস্থা করতেন। সাহাবিগণও তা অত্যন্ত আগ্রহের সাথে শুনতো এবং অনেকেই তা মুখস্ত করে নিত। অধিকন্তু সালাতে কুরআন পাঠ আবশ্যক হওয়ার কারণে প্রত্যেককেই তা সালাতে মুখস্ত পাঠ করতে হতো অথবা শুনতে হতো। ফলে আল কুরআনের নাযিলকৃত অংশ অনেকেই পুরোটা আবার অনেকেই অংশবিশেষ মুখস্ত করে নিত। নির্দিষ্ট ওহী লেখক ছাড়াও অনেকে নিজ দায়িত্বে কুরআনের বিভিন্ন অংশ লিখে রাখতো। এভাবে খেজুর পাতা, হাড় এবং পাথরে লিখিত আকারে এবং অযুত বক্ষে মুখস্ত আকারে কুরআন সুরক্ষিত হতে থাকে। আল কুরআন নাযিল সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে অসংখ্য লোকের পূর্ণ কুরআন মুখস্তও সমাপ্ত হয়। মূলত: নাবী (সা) এর সময় তাঁরই নির্দেশে পুরো কুরআন লিপিবদ্ধ করা হয় এবং স্বয়ং নাবী (সা) ও তার বহু সংখ্যক সাহাবী সম্পূর্ণ কুরআন কণ্ঠস্থ করেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) এর মৃত্যুর পর আবু বাকর (রা) খলিফা নির্বাচিত হন। এসময় বেশ কিছু ফিৎনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। একদল আরববাসী ইসলাম ত্যাগ করে পূর্বের কুফরীতে ফিরে যায়। অন্য দিকে কতিপয় ভণ্ড নিজেকে মিথ্যা নাবী দাবী করে বিভ্রান্তি

---

১. ১৫ : সূরা আল হিজর, আয়াত-৯

২. ৭৫ : সূরা আল কিয়ামাহ, আয়াত : ১৬-১৭

সৃষ্টি করে। আবার একদল মুসলিম ইসলামের ফরয বিধান যাকাতকে অস্বীকার করে। প্রথম খলিফা আবু বাকর (রা) এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। দৃঢ়তার সাথে যুদ্ধ করে এদের সকলকে পরাভূত করে উত্থিত ফিৎনাসমূহকে সমূলে উৎপাটন করেন।

কিন্তু এসকল যুদ্ধে বহু সংখ্যক সাহাবী শহীদ হয়, যাদের একটি বড় অংশ ছিল হাফেজে কুরআন। বিশেষ করে ইয়ামামার যুদ্ধে প্রায় তিন শত হাফেজে কুরআন শহীদ হয়। এতে উমার (রা.) এর মনে চিন্তার উদ্রেক হলো যে, এভাবে হাফেজে কুরআন শহীদ হলে এবং মৃত্যুবরণ করলে এক সময় যদি কোনো হাফেজ না থাকে তাহলে কুরআন সংরক্ষিত থাকবে না। এজন্য তিনি ভাবলেন যে, কুরআন কাগজে লিখিত আকারে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। তিনি তাঁর এ ভাবনা খলিফা আবু বাকর (রা) এর নিকট পেশ করলেন। একটু চিন্তা ভাবনার পর আবু বাকর (রা) তার সাথে একমত হলেন এবং আল কুরআন সংকলনের সিদ্ধান্ত নিলেন। একাজের জন্য যায়িদ বিন ছাবিত (রা) কে নিযুক্ত করা হলো, যিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাতেবে ওহী (ওহী লিখক)। কুরআন সংকলনের জন্য নাবী (সা) তাঁর ওহী লেখকদের দ্বারা যা লিখিয়েছিলেন এবং বিচ্ছিন্নভাবে অন্যান্য সাহাবীদের যার কাছে যা লিখিত ছিল, সেগুলো সংগ্রহ করা হলো এবং আল কুরআনের হাফেজদের সহযোগিতা নিয়ে শতভাগ নির্ভুল হবার নিশ্চয়তার পর কুরআনকে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করা হয়। এভাবে আল কুরআনের নির্ভুল ও প্রমাণ্য একটি সংকলন তৈরী করে তা উম্মুল মুমিনীন হাফসা (রা) এর নিকট রাখা হয়। সেটির আলোকে অনুলিপি তৈরী অথবা তার সাথে যাচাই করে নিজের পান্ডুলিপি মিলিয়ে নেওয়ার জন্য সাধারণ অনুমতি দেওয়া হয়। আরবের বিবিন্ন অঞ্চল ও গোত্রের আঞ্চলিক কথ্য ভাষা বিভিন্ন রকম ছিল। আল কুরআন নাযিল হয়েছিল মক্কার কুরাইশরা যে ভাষায় কথা বলত সে ভাষায়। কিন্তু প্রথম দিকে লোকদের সহজতার জন্য তাদের অঞ্চল ও গোত্রের কথ্য ভাষা অনুযায়ী কুরআন পাঠের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তাতে উচ্চারণ ও বাচনভঙ্গি ভিন্ন ভিন্ন হলেও অর্থের কোন হেরফের হতো না।

কিন্তু যখন ইসলামের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটল এবং দুনিয়ার বিশাল অংশ মুসলিমরা জয় করল, তখন বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন জাতির লোকেরা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করল। আরব ও অনারবের ব্যাপক মিশ্রণের ফলে আরবী ভাষার উপরও এর প্রভাব পরে। ফলে একাধিক বাকরীতিতে কুরআন পাঠের দরজা খোলা থাকলে নানাবিধ সমস্যার আশংকা দেখা দেয়। যেমন-

১. যে সকল অনারব ইসলাম গ্রহণ করে তারা আরবী ভাষায় শুধু একটি বাকরীতির সাথে পরিচিত ছিল। এর বাইরে অন্য বাকরীতিতে কেউ কুরআন পড়লে সে মনে করবে যে, উক্ত ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কুরআনকে বিকৃতভাবে পাঠ করছে। ফলে সে তার প্রতিবাদ করতে যাবে এবং তাতে ঝগড়া-ফাসাদ ও সংঘর্ষে লিপ্ত হবে।

২. এ শাব্দিক পার্থক্য আস্তে আস্তে বাস্তব বিকৃতির পথ প্রশস্ত করবে। কারণ

বাকরীতির পরিবর্তনের সাথে সাথে লোকেরা কুরআনের ভাষারও পরিবর্তন করতে পারে।

৩. যে বাকরীতিতে কুরআন নাযিল হয়েছে, তার বাইরে অন্য বাকরীতি দীর্ঘদিন বহাল থাকলে, ভাষা ও বাকরীতির বিকৃতির ফলে, নিজেদের বিকৃত ভাষায় কুরআনের মধ্যে হস্তক্ষেপ করতে পারে। এতে কুরআনের অনুপম বাক সৌন্দর্য ও অলংকার বিনষ্ট হবে। এসকল দিক বিবেচনা করে উছমান (রা) তার খিলাফতের সময় অন্যান্য সাহাবীগণের সাথে পরামর্শক্রমে আবু বাকর (রা) এর সময় সংকলিত কুরআনের নুসখা বা অনুলিপি ছাড়া অন্যান্য উচ্চারণও বাকরীতিতে লিখিত নোসখা প্রকাশ ও পাঠ নিষিদ্ধ করে শুধুমাত্র আবু বাকর (রা.) এর সময়ে লিখিত কুরআনের নোসখা সমগ্র ইসলামী দুনিয়ায় চালু করেন। বর্তমানে সারা দুনিয়ায় যে কুরআন চালু আছে, তা হুবহু সেই কুরআন যা আবু বাকর (রা) সংকলন করিয়েছিলেন এবং 'উছমান (রা) সরকারীভাবে চালু করেছিলেন।

মোট কথা কুরআন নাবী (সা.) এর সময়ে যা ছিল আজও ঠিক সে অবস্থাতেই মুসলিমদের মধ্যে প্রচলিত আছে। দীর্ঘ দেড় হাজার বছরে এর বিন্দু-বিসর্গও পরিবর্তন হয়নি।

এটি শুধু আমাদের বক্তব্য নয়, বরং ইসলাম ও তার নাবী মুহাম্মাদ মোস্তফাকে জগতের সামনে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে যে সকল পাশ্চাত্য লেখক নিজেদের শ্রম ও প্রতিভার অসদ্ব্যবহার করেছেন তারাও এসত্যটা স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে স্যার উইলিয়াম মুইর তার **Life of Mohammad** গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন, There is Probably in the world no other book which has remained twelve centuries with so pure a text. "জগতে (কুরআনের ন্যায়) পুস্তক সম্ভবত: আর একটিও নেই, দীর্ঘ দ্বাদশ সতাব্দীব্যাপী যার ভাষা সম্পূর্ণ সঠিক অবস্থায় সংরক্ষিত হয়ে আসছে।"[৩]

এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত পণ্ডিত ভন হ্যামার বলেন, We hold the Quran to be as surely Mohammad's word as the Mohamedan hold it to be the word of God.

"মুসলিমগণ কুরআনকে যেমন আল্লাহর বাণী বলে নিশ্চিত বিশ্বাস করে থাকে, আমরাও ঠিক সেরূপ ওটাকে (কুরআনকে) নিশ্চিতভাবে মুহাম্মদের বাণী বলে বিশ্বাস করে থাকি"[৪]

---

৩. মাওলানা আকরাম খাঁন, মোস্তফা চতি, পৃ. ১৫। (Life of Mohammad, ৩য় সংস্করণ, পৃ. ২১ এর উদ্ধৃতিতে)

৪. প্রাগুক্ত।

হেরা পর্বতে ওহীর প্রথম সূচনা থেকে মুসলিমদের চরম অধ:পতনের এ শোচনীয় যুগ পর্যন্ত কুরআনের প্রতিটি বর্ণ, আয়াত, সূরা ও বিন্দু-বিসর্গ পর্যন্ত অত্যন্ত কঠোর সাধনার দ্বারা সুরক্ষা করা হয়েছে। সুতরাং দিবা রাত্রির অস্তিত্বে যেমন সন্দেহ নেই, দুই আর দুই-এ চার হয় এতে যেমন সন্দেহ নেই, তদ্রুপ বর্তমানে প্রচলিত কুরআন যে মুহাম্মাদ মোস্তফা (সা.) এর সময়ের ঠিক সেই কুরআন তাতেও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

নাযিলের ক্রমধারা অনুযায়ী গ্রন্থবদ্ধ না করার কারণ

আল কুরআন যে ক্রমানুসারে নাযিল হয়েছে, সে ক্রমানুযায়ী বিন্যাস করা হয়নি। কারণ নাযিলের সময় যারা আল

কুরআনের দাও'আতের লক্ষ ছিল, তারা ইসলামের ব্যাপারে একেবারেই অপরিচিত ছিল। এ জন্য একেবারে শুরু থেকে দাও'আতী কাজ শুরু করতে হয়েছে। তখন এর প্রধান টার্গেট ছিল মক্কার কাফির ও মুশরিকগণ। এ দাও'আতের ক্রমোন্নতি অনুযায়ী তাদেরকে লক্ষ করেই বিভিন্ন স্তরে প্রয়োজন, প্রেক্ষিত ও বিভিন্ন উপলক্ষকে সামনে রেখে কুরআন নাযিল করা হয়। কিন্তু এ দাও'আত যখন পূর্ণতা লাভ করে, তখন স্বাভাবিকভাবেই এর প্রধান টার্গেট হয় মুসলিম উম্মাহ, যারা আল কুরআনকে গ্রহণ করে সে অনুযায়ী জীবন যাপন করতে এবং তার ভিত্তিতে সমাজ পরিচালনা করতে প্রস্তুত হয়েছিল। শুধু নিজেরা প্রস্তুত ছিল তাই নয়, বরং অন্যদেরকেও সেদিকে দাও'আত দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছিল। সে জন্য আল কুরআনকে নাযিলের ক্রমানুসারে বিন্যাস না করে, পরবর্তিতে এর ধারক বাহক মুসলিম সম্প্রদায়কে সামনে রেখেই এটি বিন্যস্ত করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত: আল কুরআন অনুসারীদেরকে তার শিক্ষা ও অনুশাসনকে সর্বদা ধারন ও প্রতিপালনের নির্দেশ দেয়। এ জন্য আল কুরআনের সামগ্রিক শিক্ষা ও বিধানাবলী সব সময় তাদের সামনে থাকা প্রয়োজন। নাযিলের ক্রমানুসারে বিন্যাস করলে তা পাঠের সময় এক ধরনের বিষয় সামনে থকতো এবং অন্যান্য বিষয়গুলো থাকতো দৃষ্টির আড়ালে। কিন্তু বর্তমান বিন্যাসের কারণে প্রথম দিকের নাযিলকৃত বিষয়গুলো শেষের দিকে নাযিল করা বিষয়ের সাথে এবং মক্কী জীবনে নাযিলকৃত বিষয়গুলোর সাথে মাদানী যুগে নাযিল করা বিষয়গুলো পাঠকগণ এক সাথে দেখতে পান। ফলে আল্ কুরআন পাঠকালে পাঠক আল কুরআনের সামগ্রিক মৌলিক বিষয়গুলো একত্রে এবং বার বার জানার সুযোগ পান, যা নাযিলের ক্রমানুসারে বিস্যাস করলে পাওয়া যেত না।

তৃতীয়ত: আল কুরআন নাযিলের সময় বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্য ও পরিপ্রেক্ষিতকে সামনে রেখে নাযিল হয়েছে। কিন্তু কুরআন নাযিল সম্পূর্ণ হওয়ার পর সে পরিপ্রেক্ষিতের পরিবর্তে এক নতুন সমাজ ও নতুন পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এই নতুন সমাজ ও পরিবেশের জন্য আল কুরআনের বিন্যাসও নতুনভাবে হওয়া প্রয়োজন ছিল। সে কারণেই আল্লাহর ইঙ্গিতে নাবী (সা.) নাযিলের ক্রমধারার পরিবর্তে নতুন ক্রমধারায় তা বিন্যাস করেছেন।

আল্ কুরআন সঠিকভাবে বুঝার জন্য করণীয়

পাঠকবর্গ সাধারণত: যে সকল পুস্তক পড়ে অভ্যস্ত, সেগুলোতে বইর বিষয়বস্তু ও আলোচ্য বিষয় এবং তার লক্ষ উদ্দেশ্য কী তা প্রথমেই বর্ণিত থাকে। কিন্তু আল কুরআনে এগুলোর উল্লেখ না থাকায় পাঠকগণ কুরআন পাঠ করতে এসে বেশ সমস্যায় পতিত হন। তারা এগুলো নির্ধারণ করতে না পারায় খেই হারিয়ে ফেলেন এবং কুরআন পাঠের আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। ফলে আল কুরআনের প্রকৃত মর্ম উদ্ধার এবং এর গভীরে প্রবেশ করা তাদের জন্য কষ্টকর হয়ে পড়ে। এজন্য কুরআন পাঠের শুরুতে এগুলো সম্পর্কে ধারণা লাভ করা প্রয়োজন।

আল কুরআনের বিষয়বস্তু:

আল কুরআনের বিষয়বস্তু হলো মানুষ। কারণ কুরআনে মানুষ নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। কোনটি মানুষের জন্য কল্যাণকর আর কোনটি অকল্যাণকর আল কুরআনে মূলত সেটিই আলোচনা করা হয়েছে।

আল কুরআনের কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়:

প্রবৃত্তির আনুসরণ শয়তানের কুপ্ররচনা এবং আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে মানুষ আল্লাহ, নিজের জীবন, এবং বিশ্বব্যবস্থাপনার ব্যাপারে যে দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে এবং তার ভিত্তিকে যে কর্মপন্থা অবলম্বণ করেছে প্রকৃতপক্ষে তা পৃথিবীতে বহুবিদ ভ্রান্ত পথের জন্ম দিয়েছে এবং সেগুলো অনুসরণের পরিণতিতেই মানুষ চরম ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে ও হচ্ছে। ভ্রান্ত পথগুলোর ভ্রান্তি ও তার ক্ষতিকর পরিণতি মানুষের সামনে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরার সাথে সাথে মানব জীবনের কল্যাণের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত রাজপথ উপস্থাপনই আল্ কুরআনের কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়। আল্লাহ নিজেই ঘোষণা করেছেন,

وَعَلَى اللهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ

"যেখানে অনেক বক্র পথ রয়েছে, সেখানে সঠিক পথ প্রদর্শন করা আল্লাহরই দায়িত্ব।"[৫]

আল কুরআনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য

আল্লাহ প্রদত্ত হিদায়াতকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা এবং মানুষকে সে সঠিক পথের দিকে আহ্বান জানানো, যা মানুষ নিজের গাফিলতি ও মন্দ কর্মের দ্বারা হারিয়ে ফেলেছে এবং নষ্ট করেছে।

উপরোক্ত তিনটি বিষয় সামনে রেখে আল কুরআন অধ্যায়ন করলে পাঠক দেখতে পাবেন যে, আল কুরআনের আলোচনা সামান্যতমও এগুলোর বাইরে যায়নি। বরং আগাগোড়াই এগুলোকে ঘিরেই আলোচনা পেশ করা হয়েছে। এগুলোকে মানুষের

---

৫. ১৬ : সূরা আন্ নাহল, আয়াত-৯

মগজে বদ্ধমূল করার জন্যই যমীন, আসমান ও মানুষ সৃষ্টি, নবী-রাসূলগণের অবাধ্য হওয়ার কারণে তাদের ধ্বংসাত্মক পরিণতি বর্ণনাসহ বিভিন্ন দৃষ্টান্ত ও বর্ণনা সন্নিবেশিত করা হয়েছে। যাতে প্রকৃত ব্যাপারে মানুষের ভুল ধারণা দূর হয়ে সঠিক বিষয় বোধগম্য হয় এবং সেগুলো থেকে শিক্ষা নিয়ে ভুল পথ পরিহার করে সঠিক পথে পরিচালিত হয়।

আল্ কুরআনে উপস্থাপিত মৌলিক বিষয়সমূহ

কুরআনকে সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হলে পাঠককে এর মূল বিষয় সম্পর্কে অবগত হতে হবে এবং এর মূলনীতিকে সেভাবে গ্রহণ করতে হবে যেভাবে এ কিতাব এবং এর উপস্থাপক মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) পেশ করেছেন। তাহলো-

(ক) আল্লাহ তা'আলা মানুষকে পৃথিবীতে খলিফা করে পাঠিয়েছেন। তাদেরকে চিন্তা ও বোধশক্তি এবং ভাল মন্দের পার্থক্য করার শক্তি দেওয়া হয়েছে। কোনো কিছু গ্রহণ করা না করা এবং ইচ্ছার স্বাধীনতাও তাদেরকে দেওয়া হয়েছে।

(খ) খলিফা নিযুক্তিকালে মানুষকে ভালভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, সমগ্র জাহানের মালিক, মা'বুদ ও শাসক হলেন আল্লাহ। এখানে মানুষ স্বেচ্ছাচারী নয় এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বান্দাও নয় এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ 'ইবাদাৎ বন্দেগীর মালিকও নয়। এ পৃথিবী মূলত: একটি পরীক্ষাগার। নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে সকলকে আল্লাহর নিকট ফিরে যেতে হবে। সেখানে দুনিয়ার কাজ কর্মের হিসাব নেওয়া হবে। যারা আল্লাহ প্রদত্ত হিদায়াতের অনুসরণ করেছে তারা পরীক্ষায় সফল হবে এবং পুরস্কার স্বরূপ জান্নাত লাভ করবে। পক্ষান্তরে যারা ভুল পথে পরিচালিত হবে তারা ব্যর্থ হবে এবং আখিরাতে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

(গ) পৃথিবীর প্রথম মানব যুগল- আদম ও হাওয়া (আ) কে পৃথিবীতে প্রেরণের সময় তাদের এবং তাদের সন্তানদের চলার জন্য আল্লাহ তা'আলা হিদায়াত দানের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاتَّقُواْ يَوْماً لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ

"তোমাদের নিকট আমার পক্ষ হতে হিদায়াত আসবে। যারা আমার সে হিদায়াতের অনুসরণ করবে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।"[৬] দীর্ঘ দিন তারা আল্লাহর সে হিদায়াতকে সঠিকভাবে গ্রহণ ও মান্য করে চলেছেন। কিন্তু দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর তারা ক্রমান্বয়ে হিদায়াত থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। ক্রমেই তারা আল্লাহ প্রদত্ত ন্যায় ও ইনসাফপূর্ণ শরী'আহকে বর্জন করে নিজেদের পছন্দমত বিধান তৈরি করে বিভিন্ন ভ্রান্ত পথ অবলম্বণ করতে থাকে এবং নিজেদের খেয়াল

৬. ২ : সূরা আল্ বাকারা, আয়াত-৩৮

খুশীমত বিভিন্ন ব্যক্তি ও বস্তুকে আল্লাহর সাথে শরীক করতে থাকে। আল্লাহর দেওয়া প্রকৃত জ্ঞানের সাথে বিভিন্ন চিন্তা, মতবাদ ও দর্শনকে মিশ্রিত করে অসংখ্য পথ রচনা করে নেয়। ক্রমেই তারা আল্লহ প্রদত্ত বিধান পরিবর্তন করে ফেলে। ফলে আল্লাহর এ যমীন জুলুমে ভরে উঠে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এ বিকৃত পথের অনুসারীরেদকে জোর-জবরদস্তি করে সঠিক পথে আনয়ন করেননি কিংবা অল্লাহদ্রোহিতার কারণে তাদেরকে সাথে সাথে ধ্বংস করে দেননি। বরং তিনি তাদেরকে তাদের স্বাধীনতার উপর রেখেই তাদের সঠিক পথ নির্দেশনার ব্যবস্থা করেন। এজন্য তিনি মানুষের মধ্য হতে কিছু মানুষকে মনোনয়ন করে তাদেরকে তাঁর সঠিক জ্ঞান ও বিধান দিয়ে প্রেরণ করতে থাকেন, যাতে তারা আবার সেই সত্য সঠিক পথে লোকদেরকে আহ্বান জানায়, যে সত্য পথ হতে তারা বিচ্যুত হয়েছে। তারাই ছিলেন নাবী ও রাসূল।

নাবী রাসূলগণ শত-সহস্র বছর ব্যাপী বিভিন্ন জাতি ও দেশে আবির্ভূত হতে থাকেন। তাদের দ্বীন ও মিশন একটাই ছিল, আর সেটি ছিল সেই সঠিক পথ, যা শুরুতেই মানুষকে দেওয়া হয়েছিল। যুগে যুগে নাবী রাসূলগণ দ্বীন ও হিদায়াতের দিকে লোকদেরকে সংগঠিত করে আল্লাহর বিধান কায়েম এবং আল্লাহর বিধানের বিরোধীদের প্রতিহত করার জন্য চেষ্টা-সংগ্রাম চালিয়ে যান। এর ফলে বিরাট সংখ্যক মানুষ তাদের দা'ওয়াত কবুল করে মুসলিম উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে তারা আবার গুমরাহিতে লিপ্ত হয়। যখনি মানুষ চরম গুমরাহিতে লিপ্ত হয়েছে। তখন-ই আল্লাহ তাদেরকে হিদায়াতের জন্য রাসূল প্রেরণ করেছেন। এভাবে আল্লাহ বিভিন্ন জাতির নিকট যুগে যুগে অসংখ্য নাবী রাসূল প্রেরণ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ (সা.) কে সমগ্র মানব জাতির হিদায়াতের জন্য সর্বশেষ রাসূল হিসেবে দুনিয়ায় প্রেরণ করেন, যিনি অতীত যুগের নাবীদের উম্মত এবং সর্বসাধারণ নির্বিশেষে সকলের নিকট সঠিক পথের দাও'আত প্রদান করেন। যারা তাঁর দাও'আত কবুল করে তাদের নিয়ে এমন এক দল গঠন করেন, যারা নিজেদের জীবনে আল্লাহর হিদায়াত অনুসরণ করেন এবং সমগ্র দুনিয়ার সংশোধণের জন্য সঠিক প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালান। মুহাম্মাদ (সা.) এর উপর নাযিলকৃত হিদায়াত সম্বলিত এ কিতাবেরই নাম হলো আল্ কুরআন, যা মানব জাতির দা'ওয়াতের সর্বশেষ উৎস।

একই বিষয় বার বার আলোচিত হওয়া

আল কুরআনের দা'ওয়াত ও আন্দোলন যখন যে স্তরে অবস্থান করেছে, তখন সে স্তরের উপযোগী আলোচনাই পেশ করা হয়েছে। সে স্তর কয়েক মাস বা কয়েক বছর দীর্ঘায়িত হয়েছে। ফলে সংশ্লিষ্ট স্তরের আলোচনাই বার বার পেশ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত: কোনো কোনো বিষয়কে তার গুরুত্ব ও প্রয়োজনয়ীতার আলোকে মন-মগযে ভালভাবে বদ্ধমূল করে দেওয়ার প্রয়োজনেও বার বার আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয়ত: আল কুরআনের যে সকল মৌলিক বিষয় মানুষের ঈমান, নৈতিক শক্তি ও

'আমলকে সঠিক পথে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজন, সেগুলোকে সদাসর্বদা অন্তরে জাগ্রত রাখার জন্য সকল স্তরেই সেগুলোকে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত, তাকওয়া, সালাত পুরস্কার ও শাস্তি, সবর, তাওয়াক্কুল ইত্যাদি।

তবে যে বিষয়গুলোকে বার বার আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলোকে আলোচনা করা হয়েছে বিভিন্ন আঙ্গিকে, বিভিন্ন বাচনভঙ্গি, বাকরীতি ও বিভিন্ন শব্দ সম্ভারে। এজন্য একই কথা ও বিষয় বার বার আলোচিত হলেও তা বিরক্তি সৃষ্টি না করে নতুন নতুন আবেদন ও আকর্ষণ সৃষ্টি করেছে।

কোনো প্রশ্ন সৃষ্টি হলে সেখানে তাৎক্ষণিক উত্তর না পাওয়া

আল কুরআন অধ্যায়নের সময় পাঠকের মনে অনেক স্থানেই নানাবিধ প্রশ্নের সৃষ্টি হয়। কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে সেখান থেকে তার কোনো উত্তর বা সমাধান না পাওয়ায় তিনি তার সমাধানের জন্য ব্যস্ত হয়ে পরেন এবং সমাধান না পেয়ে দারুণ সমস্যায় পতিত হন।

এক্ষেত্রে পাঠককে ব্যতিব্যস্ত না হয়ে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। তাকে প্রশ্নটি নোট করে নিয়ে সামনের দিকে পাঠ অব্যাহত রাখতে হবে। পড়তে পড়তে কোথাও না কোথাও তিনি এর উত্তর পেয়ে যাবেন। কদাচিৎ যদি এমন হয় যে, তিনি প্রথম পাঠের সময় তার উত্তর পেলেন না, তাহলে ধৈর্য ধরে দ্বিতীয়বার পড়তে হবে। ইনশা আল্লাহ অবশ্যই তিনি তার উত্তর আল কুরআনে পেয়ে যাবেন।

আল কুরআন সঠিকভাবে বুঝতে হলে যেভাবে পড়তে হবে

আল কুরআন আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে। এজন্য আল কুরআনকে ভালভাবে বুঝতে হলে আরবী ভাষা শেখা প্রয়োজন। আরবী ভাষা বুঝতে পারলে আল কুরআনের আসল স্বাদ পাওয়া যায়। যারা আরবী ভাষা বুঝেননা, তারা কোনো ভালা মানের এক বা একাধিক অনুবাদের সাহায্যে কুরআন বুঝার চেষ্টা করবেন। মনে রাখতে হবে আল কুরআন এক দু'বার পড়লে এর পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক ধারণা লাভ করা সম্ভব নয়। আল কুরআনকে গভীরভাবে উপলব্ধি ও হৃদয়ঙ্গম করতে হলে, বারবার মনযোগের সাথে তা পাঠ করতে হবে।

১. প্রথমেই পাঠককে পূর্বের পুঞ্জিভুত ধারণাসমূহ হতে মুক্ত হয়ে নিরপেক্ষ ও উম্মুক্ত মনে কুরআন অধ্যায়ন করতে হবে। কুরআনের ঢংগে কুরআনকে বুঝার চেষ্টা করতে হবে। নিজের মত ও চিন্তার পক্ষে কুরআনকে যুক্তি হিসেবে দাঁড় করাতে চাইলে কুরআনের প্রকৃত শিক্ষা লাভ করা সম্ভব হবে না। কুরআনকে গভীরভাবে বুঝতে হলে শুধু একবার পাঠ যথেষ্ট নয়। এমনকি দু' চার বার পাঠও যথেষ্ট নয়, বরং বার বার তা পাঠ করা জরুরী এবং প্রতিবারে ভিন্ন ঢংগে পড়া জরুরী।

২. প্রথম প্রথম অধ্যায়নে পাঠককে কুরআনের অর্থের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। এরপর

তার মর্ম জানার জন্য আরো গভীরভাবে অধ্যায়ন করতে হবে। প্রথম এক দু'বার সমগ্র কুরআনকে এক নজরে পাঠ করে একটি প্রাথমিক ও সাধারণ ধারণা লাভ করতে হবে যে, আল কুরআন কোন্ ধরণের কিতাব এবং তার চাহিদা কি।

৩. আল কোরআনের মৌলিক বিষয়গুলোকে বিশেষভাবে অধ্যায়ন করে সেগুলোকে রপ্ত করতে হবে। অত:পর আল কুরআনের বিষয় ভিত্তিক অধ্যায়ন করা। এক্ষেত্রে একেকটি বিষয়ে বর্ণিত কুরআনের আয়াতগুলোকে একত্রিত করে বিষয়ের ক্রমানুসারে আয়াতগুলোকে সাজিয়ে অধ্যায়ন করে সে বিষয়ে কুরআনের পূর্ণাঙ্গ ধারণা লাভ করার চেষ্টা করতে হবে। এভাবে গভীর অভিনিবেশসহ বার বার আল কুরআন পড়তে হবে এবং একেকবার একেক

আঙ্গিকে বা ঢংয়ে তা পড়তে হবে।

৪. আল কুরআন যেহেতু গ্রন্থাকারে নাযিল হয়নি, বরং বতৃতা বা ভাষণ আকারে নাযিল হয়েছে এবং সে বক্তৃতা বা ভাষণ মানব জাতির নিকট পৌঁছানোর জন্য নাবী মুহাম্মাদ (সা.)কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি এ দায়িত্ব পানল করতে গিয়ে আল কুরআনের বিভিন্ন শব্দ ও বিষয়ের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং বাস্তবে অনুশীলন করে তার প্রয়োগিক পদ্ধতি শিখিয়েছেন। এ জন্য নাবী (সা.) এর জীবন ও কর্ম তথা তাঁর সীরাত ও সুন্নাহ জানা ব্যতীত আল কুরআনকে পরিপূর্ণভাবে বুঝা সম্ভব নয়। এজন্য আল কুরআনের পাঠককে কুরআন বুঝার জন্য তাঁর নবুওয়াতী জীবনের সামগ্রিক দিক ও সুন্নাহ সম্পর্কে অবগত হতে হবে।

৫. আল কুরআন বিশ্ব মানবতার সামনে যে বিপ্লবী দা'ওয়াত পেশ করেছে, তাহলো দুনিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মানব রচিত বিধানকে অপসারণ করে আল্লাহ প্রদত্ত বিধান ও ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা করা। এটি প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করতে যে সংগ্রাম-সাধানা ও প্রচেষ্টার প্রয়োজন, তার দিক নির্দেশনাই আল কুরআনে দেওয়া হয়েছে। এজন্য আল্ কুরআন শুধু পাঠ করা যথেষ্ট নয়, বরং তা সমাজে প্রতিষ্ঠার জন্য বাস্তব ময়দানে জান মাল বাজি রেখে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এ প্রচেষ্টা চালাতে গিয়ে সে দেখতে পাবে যে, তার উপর সে অবস্থাগুলোই অতিবাহিত হচ্ছে, যা হয়েছে কুরআন নাযিলকালীন মুসলিম জনগোষ্ঠীর উপর। ফলে কুরআনের বাস্তব উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতা সে অর্জন করতে সক্ষম হবে।

৬. আল কুরআনের বিধিবিধান, নৈতিক শিক্ষা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নির্দেশনাসমূহ তখনই উপলব্ধি করা যাবে এবং এগুলোর কল্যাণকারিতা তখনই অনুভব করা যাবে, যখন এগুলো জীবনের সকল ক্ষেত্রে অনুসরণ ও অনুশীলন করা হবে এবং বাস্তবে সমাজে সেগুলো চালু হবে। তখন সমাজের সকল মানুষ চাক্ষুষভাবে সেগুলো প্রত্যক্ষ করতে এবং সেগুলোর সুফল অনুভব ও ভোগ করতে পারবে। মূলত: সেসময়ই আল কুরআনের প্রকৃত বুঝ ও সঠিক চিত্র তার সামনে সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠবে।

আল্ কুরআন সর্বজনীন ও সর্বকালীন বিধান কি না

আল কুরআনকে বিশ্বমানবতার জন্য নাযিলকৃত সর্বজনীন বিধান দাবী করা হলেও এতে প্রধানত: আরব জাতিকে সম্বোধন করেই কথা বলা হয়েছে এবং তাদের কাজকর্ম ও কৃষ্টি কালচারকেই দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করা হয়েছে। এর ফলে অনেকেই ধারণা করতে পারে যে, আল কুরআন শুধু তদানিন্তন আরবের জন্যই নাযিল হয়েছে। এটি সর্বজনীন ও সর্বকালীন নয়।

এ ধারণাটি সঠিক নয় এ কারণে যে, যে কোনো আদর্শ বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপন করতে হলে একজন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট স্থান থেকেই শুরু করতে হবে। একজন ব্যক্তির পক্ষে সে আদর্শকে একই সময় এক সাথে দুনিয়ার সর্বত্র পেশ করা সম্ভব নয়। প্রত্যেকটি বিষয়েরই একটি Starting Point অর্থাৎ শুরুর বিন্দু বা কেন্দ্র থাকে। সেখান থেকে তা আস্তে আস্তে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পরে। কোনো ব্যক্তির নিজ ভূমি এবং নিজ গোত্রই হলো এর প্রকৃষ্টতম ক্ষেত্র। এজন্য আল্লাহ সকল নাবীকে তার সম্প্রদায়ের ভাষা দিয়ে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ বলেন,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

"আমি সকল রাসূলকে তার সম্প্রদায়ের ভাষায় প্রেরণ করেছি যাতে তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বুঝাতে পারে।"[৭]

কোনো আদর্শিক আন্দোলনকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিস্তৃত করতে হলে তার চিন্তাদর্শন, মূলনীতি এবং মানব সমাজে তা যে ব্যবস্থা কায়েম করতে চায়, তা প্রথমে নিজ দেশে, নিজ জাতির কাছে সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে হবে। অতঃপর তার মূলনীতিগুলো বাস্তবে রূপায়িত করে এবং তার আলোকে একটি জীবন ব্যবস্থা সফলভাবে পরিচালনা করে দুনিয়ার সামনে নমুনা হিসেবে পেশ করতে হবে এবং তার দিকে দুনিয়াবাসীকে আহ্বান জানাতে হবে। কেবলমাত্র তখনি অন্য জাতি সেদিকে আকৃষ্ট হবে এবং তা গ্রহণের জন্য এগিয়ে আসবে। আল কুরআনের দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে ঠিক এ পদ্ধতিই অনুসরণ করা হয়েছে। তবে এর অর্থ এটি নয় যে, নিজ জাতির মধ্যে কুরআন কায়েম করার আগে বা করতে না পারলে অন্যদেরকে তার দা'ওয়াত দেওয়া যাবে না।

আল্ কুরআন আরব জাতির কাছে নাযিল হলেও তা শুধু আরব জাতির জন্যই প্রযোজ্য নয়। বরং এটি সকল জাতির জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। কেননা আল্ কুরআন দুনিয়ার সকল মানুষ ও সকল জাতির জন্য উপযোগী। আল্ কুরআন যদি সকল মানুষ ও সকল জাতির জন্য প্রযাজ্য ও উপযোগী হয়, তাহলে তাকে একটি জাতির জন্য বিশেষায়িত

৭. ১৪ : সূরা ইবরাহীম, আয়াত-৪

করা মোটেও যুক্তিযুক্ত নয়। পাঠক গভীরভাবে পাঠ করলে বুঝতে পারবেন যে, দেশ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা নির্বিশেষে সমগ্র মানব জাতির জন্যই আল্ কুরআন নাযিল হয়েছে।

অনেকেই বলতে পারেন যে, আল কুরআন শুধু সে যুগের জন্য পযোজ্য, যে যুগে তা নাযিল হয়েছে। এ ধারনাটিও সঠিক নয়। কেননা কোনো বিধান নির্দিষ্ট কোনো সময়ের জন্য নাযিল হলে, সে সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পর তার আর কোনো কার্যকারিতা বা গ্রহণযোগ্যতা থাকে না। কিন্তু আল কুরআনের কার্যকারিতা ও গ্রহণযোগ্যতা নাযিলের সময় যেমন ছিল, এখনো তেমনি আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা থাকবে।

আল কুরআনে বিষয়সমূহের বিস্তারিত ও প্রায়োগিক বিবরণ না থাকা

সাধারণভাবে পাঠক আল্ কুরআনকে একটি বিস্তারিত হিদায়াতনামা এবং একটি আইনের বই বলে মনে করেন। কিন্তু তা পাঠকালে দেখতে পান যে, এতে বিধানসমূহের কোনো বিস্তারিত বিবরণ নেই। যেমন সালাত, সিয়াম, যাকাত ইত্যাদি কিভাবে পালন করতে হবে বা আদায় করতে হবে, তার কোনো বিবরণ নেই। ফলে সে মনে করতে থাকে যে, এটা কেমন হিদায়েতনামা ও বিধিবিধান যেখানে প্রায়োগিক বর্ণনা সন্নিবেশিত নেই? এখানে পাঠককে মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা শুধু কিতাবই পাঠাননি, তার সাথে রাসূলও প্রেরণ করেছেন। আল্ কুরআনে বিষয় ও বিধানসমূহ মূলনীতি আকারে পেশ করা হয়েছে। আর রাসূল (সা.) সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ ও ব্যাখ্যা করেছেন এবং বাস্তব জীবনে সেগুলো 'আমল করে প্রায়োগিক দিক দেখিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং আল্ কুরআনের সাথে রাসূল (সা.) এর বাস্তব জীবন, কার্যাবলী ও কর্মপদ্ধতি (সুন্নাহ) কে সামনে রাখতে হবে এবং অনুসরণ করতে হবে। সেখানে আল কুরআনের সকল বিধানের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে। সুতরাং আল্ কুরআনের পাঠককে কুরআন পাঠের সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর হাদীছ বা সুন্নাহও পড়তে হবে। তাহলে তত্ত্ব ও মূলনীতির সাথে প্রয়োগপন্থা ও ব্যাখ্যাও পেয়ে যাবেন। শেখার জন্য যেমন বইর সাথে শিক্ষকের প্রয়োজন, বিল্ডিং নির্মাণের জন্য যেমন নকশার সাথে ইঞ্জিনিয়ারের প্রয়োজন, ইসলামকে জানার, বুঝার ও মানার জন্যও তেমনি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রয়োজন। এ জন্যই আল কুরআনের সাথে আল্লাহ তা'আলা রাসূল (সা.) কে শিক্ষক হিসেবে পাঠিয়েছেন। রাসূল (সা.) বলেন, "আমাকে শিক্ষক হিসেবে পাঠানো হয়েছে।" সুতরাং আল্ কুরআনের সাথে মানবতার মহান শিক্ষক মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জীবন ও কমর্কে মিলিয়ে পড়তে হবে। তাহলে আল কুরআনের প্রকৃত মর্ম বুঝা ও সে অনুযায়ী 'আমল করা সহজ হবে। ■

(তাফহীমুল কুরআনের ভূমিকা অবলম্বনে)

অনুপম সুন্দর মহামানব মুহাম্মাদ (সা) এর প্রাঞ্জল ভাষা প্রয়োগ ও আচরণ-সৌন্দর্য

প্রফেসর আর কে শাব্বীর আহমদ

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সুদর্শন, সুভাষী, অনুপম সুন্দর আচরণের এক মূর্তপ্রতীক। তিনি স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টিকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। তাঁর দৈহিক সৌন্দর্য ও মানবিক সৌন্দর্য ছিল অতুলনীয়। মিষ্টভাষী ও মিষ্টি আচরণে তিনি তাঁর শত্রুদেরও মন জয় করে নিয়েছেন। তাঁকে আল্লাহ তা'আলা বিশ্বমানবতার উত্তম আদর্শ হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা.

﴿لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূলের জীবনাচরণেই রয়েছে তোমাদের জন্য অনুকরণীয় উত্তম আদর্শ। এমন সব ব্যক্তির জন্য যারা আল্লাহর সাক্ষাৎ ও শেষ বিচার দিবসে পুরস্কারের আকাঙ্ক্ষী এবং যারা আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করে।" (৩৩ : সূরা আহযাব, আয়াত-২১)

আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তাঁর অপূর্ব চরিত্র-সংস্কৃতিকে উন্নত সনদে অভিষিক্ত করেছেন,

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾

"নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের উচ্চমার্গে উন্নীত।" (৬৮ : সূরা আল ক্বলম, আয়াত-৪)

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন অসামান্য সৌন্দর্যমণ্ডিত ও সর্বগুণের সুষমায় পরিপূর্ণ একজন আদর্শ মানব। তাঁর বিভূষিত চরিত্রের পরশে যে কোনো মানুষ শ্রদ্ধায় বিনম্র হতো। তিনি জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সব শ্রেণির মানুষের অমায়িক বন্ধু ও একান্ত নির্ভরযোগ্য আপন একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। সবার প্রয়োজনে তিনি সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছেন অকুণ্ঠিত চিত্তে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন চাঁদের চেয়ে সুন্দর। তাঁর সুন্দর অবয়ব সম্পর্কে সাহাবাদের অভিমত :

"আমরা এমন সুদর্শন মানুষ আর দেখিনি। আমরা তাঁর মুখ থেকে আলো বিকীর্ণ হতে দেখেছি।" [আবু কারসানার মা ও খালা (আল মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২৫)]।

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সুদর্শন কাউকে আমি দেখিনি। মনে হতো যেন সূর্য ঝিকমিক করছে।" (আবু হুরায়রা রা.)

"আমি একাবার জ্যোৎস্না রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে

দেখেছিলাম। তিনি লাল পোশাকে আবৃত ছিলেন। আমি একবার চাঁদের দিকে আর একবার তাঁর দিকে তাকাচ্ছিলাম। অবশেষে আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাঁদের চেয়েও সুন্দর। " (জাবের বিন সামুরা)

রাসূল মুহাম্মাদ সা. এর ভাষা উপস্থাপন :

আল্লাহ তা'আলা রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সূরা জুমু'আয় ঘোষণা করেন,

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾

"তিনি মহান সত্তা যিনি উম্মীদের মধ্যে তাদেরই একজনকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন, যিনি তাদেরকে তাঁর আয়াত শোনান, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে কিতাব (কুরআন) ও হিকমাহ (প্রজ্ঞা) শিক্ষা দেন। যদিও তারা ইতঃপূর্বে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে ডুবে ছিল। (৬২ : সূরা-জুমু'আ, আয়াত-২)

এ মহান দায়িত্ব পালনের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর অনুপম চরিত্রের মতো অনুপম হৃদয়গ্রাহী ভাষা প্রয়োগ করেন।

উম্মু মা'বাদ খুযায়্যীয়াহ (রা) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দৈহিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি তাঁর অতুলনীয় ভাষা উপস্থাপন সম্পর্কে বলেন,

"নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ছিল গাম্ভীর্যপূর্ণ কণ্ঠস্বর, নীরবতা অবলম্বন করলে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে গাম্ভীর্য, অত্যন্ত আকর্ষণীয় বাচনভঙ্গী, সুমিষ্টভাষী, সুস্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন কথাবার্তা তাঁর। না সংক্ষিপ্ত না অতিরিক্ত, কথা বললে মনে হয় মালা থেকে মুক্তা ঝরছে। বন্ধুগণ তাঁর চারপাশে গোলাকৃতি ধারণ করেন। তিনি যখন কোনো কিছু বলেন তাঁরা অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে তা শ্রবণ করেন। তাঁর পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশ প্রাপ্ত হলে তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে তা পালন করেন।"(যাদুল মা'আদ ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৪)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কথার বাক্যগুলো থেমে থেমে বলতেন, যাতে শ্রোতারা ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো হেলান দেওয়া থেকে সোজা হয়ে বসে তিনবার করে বলতেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাকপটুতা ও বাগ্মিতা ছিল অতুলনীয়। অসাধারণ ছিল তাঁর শব্দচয়ন ও বাক্যবিন্যাসের ক্ষমতা। তখনকার সময়ের আরবের প্রচলিত ভাষারীতি ও সময়োপযোগী যথাযথ ভাষা প্রয়োগের দুর্লভ ক্ষমতা আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দান করেছেন। তাই আরবের যে কোনো গোত্রের ভাষা বুঝে লোকদের উপযোগী করে তা ব্যবহার করতে তিনি সক্ষম হতেন। প্রত্যন্ত মরু অঞ্চলের বল্গাহীন বেদুঈনদের সঙ্গে যেমন তিনি সহজ রীতিতে ভাব বিনিময় করতে এবং বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারতেন, তেমনি নগরবাসী অভিজাত আরবগণের সঙ্গে উচ্চাঙ্গের

মার্জিত ভাষায় কথোপকথন ও ভাব বিনিময় করতে পারতেন। তাছাড়া আল্লাহর ওহীপ্রাপ্ত মোজেযাপূর্ণ বাণীর আকর্ষণ তো ছিল তাঁর যবানীতে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমগ্র আরবে সবচেয়ে সুভাষী ছিলেন। তাঁর ভাষা সহজ-সরল হলেও সাহিত্যিক মান ছিল উচ্চমার্গের। মূলত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীনী দাওয়াত ও দীনী সমাজ গঠনের লক্ষ্যে একটা বাকরীতি ও ভাষা শৈলী নির্মাণ করে নিয়েছেন। কথার গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য তিনি বহু পরিভাষা তৈরি করেছেন। নব নব বাগধারা, উপমা, চিত্রকল্প সৃজন করেছেন। বক্তৃতায় নতুনত্বের জন্য জাহেলিয়াতের বহু শব্দ ও রীতি-পদ্ধতি বর্জন করেছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল, স্বল্প কথায় অধিক ভাব প্রকাশের দক্ষতা। তিনি নিজেই বলেছেন, "আমাকে জাওয়ামিউল কালিম যোগ্যতা দেওয়া হয়েছে।" (মুসলিম : আবু হুরাইরা রা.)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জাওয়ামিউল কালিমের কিছু উদাহরণ :

১. আসলিম তাসলিম - মুসলিম বা সমর্পিত মানুষ হও শান্তিতে থাকবে।
২. লাইসাল খাবরু কাল ম'আইনাহ - দেখা ও শুনা এক কথা নয়।
৩. আলহারবু খিদ'আতুন - যুদ্ধ একটি কৌশল।
৪. আল মারউ মা'আ মান আহাব্বা - মানুষ যাকে ভালোবাসে কিয়ামত দিবসে তার সাথেই থাকবে।
৫. তারকুশ্ শাররা সাদাকাতুন - খারাপ কাজ বর্জন করাও একটা ভালো কাজ।
৬. আল কালিমসতুত তাইয়্যেবাতু সাদাকাতুন - ভালো কথা বলাও সৎ কাজের শামিল।
৭. মান লা ইয়ারহামু লা ইয়ুরহামু - যে দয়া করে না সে দয়া পায় না।
৮. সাইয়্যেদুল কাওমে খাদিমুহুম - জনগণের যিনি সেবা করেন, তিনিই তাদের নেতা।

হাদিসশাস্ত্র ও সীরাতগ্রন্থগুলোতে রাসূলের ভাষা, উক্তি ও অল্প কথার দ্ব্যর্থবোধক বাচনভঙ্গি মুক্তার মতো জ্বলজ্বল করে ওঠে আমাদের মানসপটে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আচার-আচরণ সংস্কৃতি :

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন পরিপূর্ণ মানবিক গুণে গুণান্বিত এক অসাধারণ মানুষ। ধৈর্যশীলতা, সহনশীলতা, দয়াদ্রতা, সংবেদনশীলতা, পরোপকারিতা, উদারচিত্ততা ও ক্ষমাশীলতার মতো হাজারো মানবিক গুণের সমাবেশে একজন আদর্শ অনুকরণীয় মহামানব ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। মানবজাতির ইতিহাস অনুসন্ধানে দেখা যায়, অনেক গুণে গুণান্বিত মানুষদের মধ্যেও কোনো না কোনো মানবিক ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

ছিলেন মানবিকতার সর্বগুণে বিভূষিত এমন এক ব্যক্তিত্ব, যাঁর মধ্যে সামান্যতম ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়নি। প্রাসঙ্গিকভাবে লক্ষ্যণীয় যে, শত্রুদের শত্রুতা, ভ্রষ্ট লোকদের ভ্রষ্টতা যতই বৃদ্ধি পেতো রাসুলুল্লাহ সা: এর সহনশক্তি ও ধৈর্যশীলতা ততোই বৃদ্ধি পেতো।

আয়িশা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুটো কাজের অধিকার দেওয়া হলে তিনি সহজতর কাজটি গ্রহণ করতেন। কোনো ধরনের অন্যায় বা পাপের কাজ হলে কখনো তা গ্রহণ করতেন না। ব্যক্তিগতভাবে তিনি তাঁর প্রতি কোনো অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন না। কিন্তু আল্লাহদ্রোহিতামূলক কোনো কাজ বা কথার তড়িৎ প্রতিশোধ নিতেন শুধু আল্লাহর উদ্দেশ্যে। তিনি সব সময় ক্রোধ ও প্রতিহিংসাপরায়ণতার ঊর্ধ্বে থাকতেন। (সহীহ আল বুখারি ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫০৩)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাষ্ট্র ও জনপদে সর্বোচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েও সব শ্রেণি পেশার মানুষের সাথে উদারনৈতিক যোগাযোগ অক্ষুণ্ন রাখতেন। সমাজের উঁচু-নিচু সবার সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক বজায় রাখতেন। জনবিচ্ছিন্নতা, গর্ব ও অহংবোধ তাঁর মধ্যে ছিল না। তিনি যে ভ্রাতৃত্ববোধের কল্যাণ রাষ্ট্র গড়ে তুলেছিলেন, তার অনিবার্যতা ছিল সকল মুসলিম পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে। অধুনা পাশ্চাত্য সভ্যতায় যে এলিগরি ভাবনার স্বার্থপরতা ও জনবিচ্ছিন্নতার সংস্কৃতি লালিত হচ্ছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যোগাযোগ ব্যবস্থা ও আচরণ ছিল এর থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং মানবিক।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শিষ্টাচার ছিল, ছোট বড় যার সাথে সাক্ষাৎ হতো, প্রথমেই সালাম ও কুশল বিনিময় করতেন। নিজ বাড়িতে প্রবেশকালে এবং বেরুবার কালে পরিবার-পরিজনদের সালাম প্রদান করতেন। বৈঠকাদিতে সাহাবীগণ তাঁর সম্মান প্রদর্শনে উঠে দাঁড়ানোকে তিনি অপছন্দ করতেন। কারো ঘাড় না ডিঙিয়ে বৈঠকের এক পাশেই তিনি বসে পড়তেন।

আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আল্লাহর একজন সাধারণ বান্দা যেভাবে উঠাবসা করে, আমিও সেভাবেই উঠাবসা করি।"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যথেষ্ট গুরুত্বসহ রোগী দেখতে যেতেন। মাথার কাছে বসে রোগীর অবস্থা জিজ্ঞেস করতেন। ললাটে ও শিরায় হাত রাখতেন। মুখাবয়বে, বুকে, পেটে সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিতেন। রোগীর জন্য উপকারী খাবার এনে দিতেন। সান্ত্বনা দিয়ে বলতেন, "চিন্তার কোনো কারণ নেই, আল্লাহ চাহেন তো অচিরেই তুমি রোগমুক্ত হবে।" তিনি এমন মানবদরদী নবী ছিলেন যে, রোগাক্রান্ত মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ বিন উবাইকে দেখতে গিয়েও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন। কেউ মারা গেলে সাথে সাথে চলে যেতেন। মুসলিম ও ঋণমুক্ত থাকলে নিজেই জানাযা পড়াতেন এবং মৃতের গুনাহ-খাতা মাফের জন্য দো'আ করতেন।

স্নেহ ভালোবাসার উজ্জ্বল প্রদীপ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অতি প্রিয়জনকে ভালোবেসে তার নাম সংক্ষেপে ডাকতেন। আবু হুরাইরা (রা) কে ডাকতেন "আবু হুর" আয়িশা (রা)কে ডাকতেন "আয়িশ" নামে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিশুদের বড়ই কাছের মানুষ ছিলেন, তাদের কাছে টেনে প্রাণভরে আদর, সোহাগ ও দো'আ করতেন। আয়িশা (রা) বলেন, আল্লাহর রাসূল কখনো কোনো ক্রীতদাসকে গালমন্দ বা প্রহার করেননি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"তোমাদের মধ্যে উত্তম সে, যে তার পরিবারের কাছে উত্তম। আর আমি আমার পরিবারের কাছে উত্তম।" (সুনানে তিরমিযি : ৩৮৯৫, সুনানে ইবনে মাজাহ : ১৯৭৭)

নিজ স্ত্রীগণের সাথে উত্তম আচরণের দিক থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অতুলনীয় দৃষ্টান্ত ছিলেন। স্ত্রী, সন্তানাদি, নাতি, নাতনিদের সাথে তাঁর আচরণ যেমন ছিল অমায়িক ও দরদী, তেমনি সাহাবীগণের সাথে এমন মানবিক আচরণ ও বাকরীতি প্রয়োগ করতেন, যার প্রভাব তার মেধা ও মগজে পৌঁছার আগেই হৃদয়-গহীনে পৌঁছে যেতো। সাহাবীগণও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রাণ উজাড় করে ভালোবাসতেন। সৈন্যদের সাথেও রাসূলের আচরণ ছিল উত্তম ও নসীহাপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আচার-আচরণের এ সব অনন্য বৈশিষ্ট্য তাঁর নবুয়্যতের সত্যতার প্রমাণ বহন করে।

"বালাগাল ঊলা বিকামালিহি
কাশাফাদ্দুজা বিজামালিহি
হাসুনাত জামিঊ খিসালিহি
সাল্লো আলাইহি ওয়া আলিহি।"

তাঁর পূর্ণতার দ্বারা তিনি
উচ্চ মর্যাদায় উপনীত হয়েছেন
তাঁর সৌন্দর্য অন্ধকারকে বিদূরিত করেছে
তাঁর বৈশিষ্ট্যসমূহ ছিল মাধুর্যমণ্ডিত
সুতরাং তাঁর ও তাঁর পরিবারের প্রতি দরূদ পাঠ কর।

পরিশেষে বলা যায়, আমরা যারা দা'ঈ ইলাল্লাহ হিসেবে আল্লাহর দীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিবেদিত হতে চাই, আমাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুপম সুন্দর, পুত-পবিত্র চরিত্র অর্জন করে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতো প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী ভাষা ও আচরণে মানব সমাজের কাছে নিজেদের উপস্থাপন করতে হবে। মানব দরদী হয়ে, মানুষের মন জয় করে ইসলামের সুমহান জীবন ব্যবস্থায় একটি মানবিক পৃথিবী গড়ে তুলতে হবে। যাতে করে আমাদের

বর্তমান ও আগামী প্রজন্ম নৈতিকতায় সমৃদ্ধ স্বাধীন জাতি হিসেবে বেঁচে থাকতে পারে। আল্লাহ তা'আলার সন্তোষ অর্জন করে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলকাম হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনাদর্শ গ্রহণ করে সর্বোত্তম মানুষ হিসেবে নিজেদের ব্যক্তিজীবন ও সমাজ জীবন গড়ে তোলার তাওফিক দান করুন। আমীন!

তথ্যসূত্রঃ

১. সীরাতে ইবনে হিশাম।
২. উসওয়াতুল লিল আলামিন।
৩. মানবতার বন্ধু মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।
৪. আর্-রাহীকুল মাখতূম। ■

আল ফালাহ্ বিজ্ঞাপন

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত বই পড়ুন, জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করুন।

পবিত্র মাহে রবিউল আউ'য়াল উপলক্ষে বিশেষ কমিশনে বই কিনুন!

এই অফার চলবে ৫ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর, ২০২৪ পর্যন্ত

পাইকারী ৪২% এবং খুচরা ৩৫% কমিশনে ক্রয় করুন

নং	বইয়ের নাম	লেখক	মূল্য
১	দারসুল কুরআন সংকলন-১-২	এ.কে.এম. নাজির আহমদ	১২০/-
২	দারসুল কোরআন সিরিজ-১-৩	প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ	৪১০/
৩	দারসুল হাদীস সিরিজ-১-৩	ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভুঁইয়া	৩৬০/-
৪	কুরআন অধ্যয়ন সহায়িকা	খুররম মুরাদ	১৩০/-
৫	আল কুরআন এক মহাবিস্ময়	ড. মরিস বুকাইলি	১০০/-
৬	সাহীহ্ আল্ বুখারী ১-৫	ইমাম বুখারী (রহ)	২৭৭০/-
৭	সহীহ মুসলিম ১-৮	ইমাম মুসলিম (র)	৪১২০/
৮	জামে আত-তিরমিযী ১-৬	ইমাম তিরমিযী (র)	২২০০/-
৯	সুনান আবু দাউদ ১-৬	ইমাম আবূ দাউদ (র)	২২৮০/-
১০	সুনান আন-নাসাঈ ১-৬	ইমাম নাসাঈ (র)	২১৬০/-
১১	মুসনাদে আহমাদ (১)	ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র)	৩৫০/
১২	রিয়াদুস সালেহীন ১-৪	ইমাম মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আন-নববী (র)	১৩০০/-
১৩	শু'আবুল ঈমান	ইমাম বাইহাকী (র)	১২০/-
১৪	সীরাতে ইবনে হিশাম	আকরাম ফারুক অনূদিত	৪৫০/-
১৫	আবু বাকর আছ্ছিদ্দিক (রা)	ড. আহমদ আলী	৭৫০/-
১৬	উসমান ইবনু আফ্ফান (রা)	ড. যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক	৩৫০/-
১৭	আসহাবে রাসূলের জীবনকথা ১-৭	ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ	২২২০/-
১৮	তাবি'ঈদের জীবনকথা ১-৪	ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ	১১২০/-
১৯	ইসলামী জাগরণের তিন পথিকৃৎ	এ.কে.এম. নাজির আহমদ	১৮০/-
২০	ইসলামী অর্থব্যবস্থার মৌলিক ধারণা	ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী	১৬০/-
২১	কবিরা গুনাহ	ইমাম আয যাহাবী (র)	১৭০/-
২২	আমরা সেই সে জাতি (১-৩)	আবুল আসাদ	৩৮০/-
২৩	বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস	আব্বাস আলী খান	৩০০/-
২৪	আল আকসা মসজিদের ইতিকথা	এ এন এম সিরাজুল ইসলাম	৮০/-

২৫	উসমানী খিলাফাতের ইতিকথা	এ.কে.এম. নাজির আহমদ	৭৫/-
২৬	মুসলিম নারীর হিজাব ও সালাতে তার পোষাক	শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ (র)	৬০/-
২৭	ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী	ড. মুসতাফা আস্ সিবায়ী	১৪০/-
২৮	নারী অধিকার পর্দা ও নারী পুরুষে মুসাফাহা	ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী	১০০/-
২৯	পর্দার আসল রূপ	এ.কে.এম. নাজির আহমদ	৩০/-
৩০	দি সোর্ড অব আল্লাহ	লে. জেনারেল এ.আই. আকরাম (অব.)	৩৫০/-
৩১	দৈনন্দিন জীবনে তাকওয়া	ড. মুহাম্মাদ ছাইদুল হক	১৪০/-
৩২	মদিনা মুনাওয়ারার ইতিকথা	এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম	২০০/-
৩৩	মক্কা মুনাওয়ারার ইতিকথা	এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম	৬০০/-
৩৪	ইবনুল কায়্যিম (রহ)	ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী	৪৪০/-
৩৫	আদর্শ মানব মুহাম্মাদ (সা)	এ. কে. এম. নাজির আহমদ	৭০/-
৩৬	আল্লাহর দিকে আহ্বান	এ. কে. এম. নাজির আহমদ	৪০/-
৩৭	ইসলামী নেতৃত্ব	এ. কে. এম. নাজির আহমদ	৬০/-
৩৮	রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পঠিত দু'আ	ইমাম ইবনে কাইয়েম (র)	১৩০/-
৩৯	ইসলামী ব্যাংকিং : বৈশিষ্ট ও কর্মপদ্ধতি	শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান	৬০/-
৪০	সুদ	শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান	৬০/-
৪১	আপনাদের প্রশ্নের জওয়াব (১-৩)	আল্লামা ইউসুফ লুধিয়ানাবী (র)	৪২০/-
৪২	আল্লাহর পরিচয়	এ.কে.এম. নাজির আহমদ	২৫/-
৪৩	সফল জীবনের পরিচয়	এ.কে.এম. নাজির আহমদ	৭০/-
৪৪	রাসূলুল্লাহর শিক্ষাদান পদ্ধতি	ড. মুহাম্মাদ আবদুল মাবুদ	৪০০/-
৪৫	ইসলামের দৃষ্টিতে পোষাক পর্দা ও সাজসজ্জা	ড. আহমদ আলী	১৮০/-
৪৬	তাযকিয়াতুন নাফস	ড. আহমদ আলী	২০০/-
৪৭	ইসলামের শাস্তি আইন	ড. আহমদ আলী	২২০/-
৪৮	ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজ সেবা ও সংস্কার	ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী	২২০/-
৪৯	মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য	অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম	৩০/-
৫০	আল্লাহর হক মানুষের হক	জাবেদ মুহাম্মাদ	২৫০/-
৫১	ইলমুল ফিকহ ঃ সূচনা ও ক্রমবিকাশ	ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক	৪০০/-
৫২	ইমাম বুখারী (রহ.) জীবনি ও হাদীস চর্চা	ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন	৪০০/-
৫৩	নামায কায়েম কর	অধ্যাপক মোশাররফ হোসাইন	৩০/-

যোগাযোগ : ৩৪/১ নর্থ ব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট, (নীচতলা)
বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০। মোবাইল : ০১৭৪১ ৬৭৭৩৯৯
কাঁটাবন মসজিদ কমপ্লেক্স, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা। মোবাইল : ০১৬১২-৯৫৩৬৭০, ০১৭৩২-৯৫৩৬৭০
E-mail : dhakabic@gmail.com, web : www.bicdhaka.com

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ ঃ স্বামীর নিকটাত্মীয় যেমন ভাই, চাচা-জেঠা-মামা, খালু প্রভৃতির সাথে এবং গাড়ীর ড্রাইভার ও ডাক্তারের সাথে অনেক সময় যুবতী মেয়েদের ও মহিলাদের নির্জন অবস্থান হয়ে থাকে, এ সম্পর্কে ইসলামী শরী'আহর বিধান জানতে চাই?

আব্দুল জলীল, ঢাকা।

উত্তর ঃ প্রশ্নে তিন শ্রেণীর পুরুষের সাথে যুবতী মেয়ে ও মহিলাদের নির্জন অবস্থান করা সম্পর্কে শরী'আতের বিধান জানতে চাওয়া হয়েছে। প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও বাস্তবসম্মত। যেটা আমাদের সমাজে নির্দ্বিধায় অহরহ ঘটে চলছে। কেউ কিছুই মনে করছে না। তাই আমরা প্রশ্নে উল্লেখিত তিন শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কে পৃথক পৃথকভাবে জবাব দেব। ইনশা আল্লাহ।

প্রথম: স্বামীর নিকটাত্মীয় যেমন ভাই, চাচা, জেঠা, মামা, খালু প্রভৃতি। এরা স্বামীর নিকটাত্মীয় হলেও এরা কেউই স্ত্রীর মাহরাম নয়। বরং এদের সবার সাথেই স্ত্রীর পর্দা করা ফরয।

হাদিসে এসেছে,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ.

উকবা ইবন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা গায়রে মাহরাম (বেগানা) মহিলাদের কাছে যাওয়া থেকে দূরে থাকো। একজন আনসারী সাহাবী (রা) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল হামউ সম্পর্কে আপনি কি বলেন? জবাবে তিনি বললেন আল হামউ আল মাউতু অর্থাৎ হামউ হলো মৃত্যু বা মৃত্যুতুল্য। (বুখারী ৬৭/১১২, হা. নং ৫২৩২; মুসলিম ৩৯/৮, হা. নং ২১৭২, আহমাদ ১৭৩৫২)

হাদীসে বলা হয়েছে "আল হামউ হলো নারীদের জন্য মৃত্যু বা মৃত্যু তুল্য। হাদীসের বাচনভঙ্গী থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিয়মান হয় যে, এটা অবশ্যই নারীদের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর কিছু হবে। যা থেকে নারীগণের নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলা অত্যন্ত জরুরী। তা না হলে মৃত্যুর মত অনাকাংখিত কোনো দূর্ঘটনা ঘটে যাওয়া অসম্ভব নয় বরং খুবই সম্ভব, এমনকি কখনো কখনো অনিবার্যও বটে।

এ সম্পর্কে সহীহ মুসলিমে এসেছে, ইবন ওহাব বলেন, আমি লাইস ইবন সা'দকে বর্ণনা করতে শুনেছি,

الحمو اخ الزوج وما اشبهه من اقارب الزوج ابن العم و نحوه.

"আল হামউ, হলো, স্বামীর ভাই-দেবর- এবং অনুরূপ স্বামীর ঘনিষ্ট আত্মীয়-স্বজন যেমন চাচাতো ভাই ইত্যাদি। অর্থাৎ স্বামীর চাচাতো, জেঠাতো, মামাতো, খালাতো, ফুফাতো

ভাই এবং স্বামীর চাচা, জেঠা, মামা, খালু, ফুফা প্রমুখগণের সাথে স্ত্রীর পর্দা করা ফরয।
স্বামী ও মাহরাম পুরুষ ছাড়া নির্জনে একজন নারী ও একজন পুরুষের একান্ত সাক্ষাত করা জায়েয নয়। কেননা এমতাবস্থায় যে কোনো সময় বিপদ ঘটার আশংকা থাকে। এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো পরপুরুষের (গায়রে মাহরাম পুরুষের) সাথে কোনো নারীর একান্তে অবস্থান করা থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ

কোনো পুরুষ যেনো কোনো অবস্থাতেই কোনো (গায়রে মাহরাম) নারীর সাথে একান্তে অবস্থান না করে (সহীহ আল বুখারী, অধ্যায়: জিহাদ, হাদীস নং- ৩০০৬)
অন্য এক বর্ননায় এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثالثهما الشَّيْطَان

কোনো পুরুষ যেনো কোনো অবস্থাতেই (গায়রে মাহরাম) কোনো নারীর সাথে একান্তে অবস্থান না করে। কেননা একজন পুরুষ ও একজন নারী নির্জনে একত্রে অবস্থান করলে সেখানে তৃতীয় জন হয় শয়তান। (মিশতাতুল মাসাবীহ, হাদীস নং ৩১১৮, তিরমিযী)
বেগানা একজন পুরুষ ও বেগানা একজন নারীর নির্জন অবস্থানকালে তাদের মাঝে তৃতীয় জন যদি ইবলিস শয়তান হয়, তাহলে মানব জাতির চির শত্রু ও ধোকা দেয়াতে পটু, মরদূদ শয়তান ধোকা দিয়ে দূর্ঘটনা ঘটাতে মোটেই ভুল করবে না বরং সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করবেই।
অতএব, এদের কারো সাথেই স্ত্রীর নির্জন বা একান্তে অবস্থান করা ও একাকী হওয়া জায়েজ নয় বরং সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ ও হারাম।
অনেক সময় মহিলারা প্রাইভেট গাড়ীতে যাতায়াত করে থাকেন। এক্ষেত্রে ড্রাইভার যদি গায়রে মাহরাম কোনো পুরুষ হয় আর যাত্রী যদি হন মহিলা তাহলে উক্ত মহিলার অপরিহার্য করনীয় হবে তার সাথে তার মাহরাম কোনো পুরুষ সফর সঙ্গী রাখা অথবা যাত্রী যদি কেবল মহিলা হয় তাহলে কমপক্ষে দুই বা ততোধিক প্রাপ্ত বয়স্ক ও বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন যাত্রী হতে হবে। অন্যথায় এরূপ প্রাইভেট গাড়ীতে গায়রে মাহরাম ড্রাইভারের সাথে কোনো নারীর একা চলাচল করা জায়েজ হবে না বরং তা হবে না জায়েজ ও হারাম। অনুরূপভাবে একাধিক নারী যাত্রী কোনো প্রাইভেট গাড়ীতে সফর করছেন, সফর শেষে ড্রাইভার তাদের সবাইকে এক এক করে নিজ নিজ গন্তব্যে পৌঁছে দিচ্ছেন, সব শেষে যিনি থাকছেন তার সাথে যদি তার মাহরাম সফরসঙ্গী না থাকেন তাহলে কিছু সময়ের জন্য হলেও ড্রাইভারের সাথে তার একান্ত ও নির্জন অবস্থান হয়ে থাকে বা হতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে যিনি গাড়ীতে সর্বশেষ থাকবেন তার করনীয় হবে তিনি মাহরাম কোনো পুরুষ সাথে রাখবেন অথবা অন্যদের সাথে গাড়ী থেকে নেমে নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় গন্তব্যে পৌঁছবেন।

অনুরূপভাবে কোনো মহিলা রোগী যদি একাকী কোনো পুরুষ ডাক্তার দেখাতে যান তাহলে তাকেও কিছু সময় ডাক্তারের চেম্বারে ডাক্তারের সাথে নির্জনে অবস্থান করতে হতে পারে, এটাও শরী'আতে জায়েয নয়। এ ক্ষেত্রে ঐ নারী রোগীর করনীয় হবে তিনি তার মাহরাম কাউকে সাথে নিয়ে ডাক্তার দেখাতে যাবেন, একাকী যাবেন না। কিংবা ডাক্তারের সাথে যদি তার কোনো সহকারী থাকেন তাহলে সেখানে ডাক্তারের সাথে উক্ত নারী রোগীর নির্জন অবস্থানের অভিযোগ থাকে না বিধায় সেটা চলতে পারে। অবশ্য এসব ক্ষেত্রে নারীগণের মাহরাম সঙ্গী রাখাই নিরাপদ। কারণ পথে যাতায়াতের ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা-অসুবিধা থাকতে পারে।

প্রশ্ন-২ ঃ ওমরা কাকে বলে? ওমরা পালনের সময় ও ওমরার নিয়ম জানতে চাই?

জসিম উদ্দীন

চৌগাছা, যশোর।

উত্তর ঃ ওমরার শাব্দিক অর্থ যিয়ারত। শরী'আতের পরিভাষায়- আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ও তাঁর হুকুম পালনের উদ্দেশ্যে নিমোক্ত কাজগুলির সমষ্টির নাম ওমরা।

এক ঃ ইহরাম বাঁধা বা ওমরা পালনের নিয়ত করাঃ

ইহরাম বাঁধার পূর্বে ইহরামের প্রস্তুতি হিসেবে যে কাজগুলি করতে হবে তাহলো:-

ক. পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অর্জন অর্থাৎ- নখ কাটা, গোঁফ কাটা, বগল প্রভৃতির পশম কামানো, উযু বা গোসল করা।

খ. সেলাই করা কাপড় ছেড়ে ইহরামের কাপড় পরিধান করা। নারীগণ তাদের স্বাভাবিক কাপড় পরিধান করবেন।

গ. শরীর ও কাপড়ে সুগন্ধি লাগানো। এটা অবশ্যই ইহরামের পূর্বে করণীয়, পরে নয়।

ঘ. দু'রাক'আত সালাত আদায় করা। প্রথম রাক'আতে সূরা ফাতিহার পর সূরা কাফিরূন, দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস পড়া।

ঙ. ইহরাম বাঁধার স্থান ইহরাম বাঁধার স্থানকে 'মীকাত' বলা হয়। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ও ইরান থেকে যারা হজ্জ ও ওমরা করতে যান তাদের মীকাত হলো 'ইয়া লামলাম' নামক পাহাড়। এই স্থান অতিক্রম করার আগেই হজ্জ ও উমরা যাত্রীগণকে ইহরাম বাধঁতে হবে। অবশ্য বিমান পথের যাত্রীগণকে বিমানে আরোহনের পূর্বে নিজ বাসা-বাড়ী, হাজী ক্যাম্প কিংবা বিমান বন্দরেই ইহরাম বেঁধে নেয়া আবশ্যক। অগত্যা কেউ যদি এর মধ্যে ইহরাম বাধার সময় বা সুযোগ না পান তাহলে তিনি বিমানেও ইহরাম বাঁধতে পারবেন। তবে সেটা অবশ্যই বিমানের মীকাত অতিক্রম করার আগেই হতে হবে। কোনো অবস্থাতেই যেনো মীকাত অতিক্রম করার পরে না হয়, সে ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকতে হবে। এক্ষেত্রে সতর্কতা হলো, বিমানের চড়ার আগেই বাসা-বাড়ী, হোটেল বা বিমান বন্দর বা অন্য সুবিধাজনক কোন স্থানে ইহরাম বেঁধে নেয়া।

দুই ঃ পবিত্র কা'বার চারদিকে তাওয়াফ করা। তাওয়াফের জন্য নিম্নোক্ত শর্তসমূহ পূর্ণ করতে হবে।

ক. সর্বপ্রকার নাপাকী থেকে পবিত্র হওয়া। বড় নাপাকী থেকে গোসলের মাধ্যমে, ছোট নাপাকী থেকে ওযুর মাধ্যমে এবং শরীর বা কাপড়ে কোনো নাপাক বস্তু লেগে থাকলে উক্ত জায়গা ধুয়ে ফেলার মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা।

খ. সতর ঢাকা। অর্থাৎ পাক পবিত্র পোশাক পরিধানের মাধ্যমে শরীরের গোপনীয় অঙ্গসমূহ (সতর) আবৃত করা বা ঢেকে রাখা।

গ. তাওয়াফে সাতটি চক্কর পূর্ণ করা। কোনো চক্করে এক কদমত্ত বাকী না থাকা। অন্যথায় তাওয়াফ শুদ্ধ হবে না। আর যদি চক্করের সংখ্যা নিয়ে সন্দেহ হয় তাহলে কম সংখ্যাটি ধরে গণনা করবে যাতে সাতটি চক্কর নিশ্চিত হয়। তাওয়াফ শেষ করার পর সন্দেহ হলে আর কিছুই করনীয় থাকবেনা। তাওয়াফ শুদ্ধ হবে।

ঘ. হাজরে আসওয়াদ থেকে তাওয়াফ শুরু করে হাজরে আসওয়াদে এসে তাওয়াফ শেষ করা। এটা হবে এক চক্কর। এভাবে সাত চক্কর পূর্ণ করা।

ঙ. বাইতুল্লাহ (কাবা ঘর) কে বামদিকে রেখে তাওয়াফ শুরু করতে হবে। ডান দিকে রেখে তাওয়াফ করলে তাওয়াফ শুদ্ধ হবে না।

চ. তাওয়াফ কা'বা ঘরের বাহির দিয়ে করতে হবে। হাজরে ইসমাইলের ভিতর দিয়ে তাওয়াফ করলে তাওয়াফ শুদ্ধ হবেনা। কেননা হাজরে ইসমাঈল ও সাজরাওয়ান বাইতুল্লাহর অংশ। (হাজরে ঈসমাঈল কা'বার উত্তরে অর্ধবৃত্তাকার বেষ্টনীতে আবদ্ধ)। এই হাজরে ইসমাঈল পুরোটা বাইতুল্লাহর অংশ নয়। এর প্রায় তিন মিটার বাইতুল্লাহর অংশ।

ছ. বিরতিহীনভাবে তাওয়াফ করা ইমাম মালেক ও ইমাম আহমাদ (র) এর মতে শর্ত। বিনা ওযরে স্বল্প বিরতী এবং গ্রহনযোগ্য ওযর থাকলে বেশি বিরতী দেয়াতে ক্ষতি নেই। হানাফী ও শাফে'ঈগণের মতে তাওয়াফ বিরতীহীনভাবে করা সুন্নাত, শর্ত নয়। জরুরী কোন কারণে বিরতী হয়ে গেলে বিরতীর পূর্বে যতটুকু তাওয়াফ করা হয়েছিল বিরতীর পর বাকী টুকু পূর্ণকরে তাওয়াফ শেষ করবে।

জ. প্রত্যেক চক্করে রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করা সুন্নাত।

তাওয়াফ শেষ হলে নিম্নোক্ত আয়াত পড়তে পড়তে

وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

"তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের জায়গারূপে গ্রহন করো।" সূরা বাকারা : ১২৫

মাকামে ইবরাহীম, হাতীম বা যেখানে জায়গা পাওয়া যাবে সেখানে গিয়ে দু'রাকআত সালাত আদায় করা সুন্নাত। ইমাম আবু হানিফা (র) এর মতে ওয়াজিব। (ফিকহুস সুন্নাহ: ১/৫৬৭) এর পর পেট ভরে যমযমের পানি পান করা মুস্তাহাব।

যমযমের পানি পান করার সময়ের দুআ:-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْماً نَافِعاً، وَرِزْقاً وَاسِعًا وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ.

"ইয়া আল্লাহ! আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করি উপকারী ইলম, আর্থিক সচ্ছলতা এবং সকল রোগ থেকে নিরাময় লাভের।

যমযমের পানিপান করার পর মূলতাযামের নিকট গিয়ে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ চেয়ে নত ও বিনম্র হয়ে এবং কাকুতি মিনতি সহকারে দু'আ করা। এরপর সম্ভব হলে হাজরে আসওয়াদে চুমু দেবে। চুমু দেয়া সম্ভব না হলে হাত দিয়ে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করবে এবং হাতের স্পর্শের স্থানে চুমু দিবে তাও (স্পর্শ করাও) যদি সম্ভব না হয় তাহলে ডান হাত উঁচু করে হাজরে আসওয়াদের দিকে ইশারা করবে। এরপর সাফা ও মারওয়ার সা'ঈ করবে।

সাফা ও মারওয়ার মধ্যকার রাস্তাটি আল্লাহ তা'আলার পবিত্র নিদর্শন সমূহের অন্যতম। হজ্জ ও ওমরায় এই পাহাড় দুটির মাঝে সাঈ করা হানাফী মাযহাবে ওয়াজিব এবং অন্যান্য মাযহাবে ফরয। সাফা পাহাড় বর্তমানে বাবুস সাফা সংলগ্ন। এটি মসজিদে হারামের পূর্ব দক্ষিণে অবস্থিত। আর মারওয়া হচ্ছে মসজিদে হারামের পূর্ব উত্তরে বাবুল মারওয়া সংলগ্ন। সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মধ্যকার রাস্তাটিকে মাসআ, (সাঈ করার স্থান) বলা হয়। এই রাস্তা দিয়ে উপরিউক্ত দুই পাহাড়ে সাঈ করতে হয়।

এই রাস্তাটির (মাসআর) দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৪০৫ মিটার এবং প্রস্থ হচ্ছে ৫০ মিটার। দুই পাহাড়ের মাঝখানে সাতবার সাঈ করতে হয়। সাফা থেকে মারওয়ায় গেলে একবার এবং মারওয়া থেকে সাফায় গেলে আরেকবার। এইভাবে সাফা ও মারওয়ার মাঝে যাওয়া ও আসা মিলে মোট সাতবার সাঈ করতে হবে।

সাঈ শুরু করতে হবে সাফা থেকে এবং শেষ হবে মারওয়ায় গিয়ে।

সাফা ও মারওয়ায় সা'ঈ করতে গিয়ে দু'টি সবুজ বাতি দ্বারা চিহ্নিত স্থানের মাঝে ছাড়া সাফা ও মারওয়ার সাঈ হেঁটে করা মুস্তাহাব। দুই সবুজ বাতির মাঝে রমল করা ঘন ঘন পা ফেলে দ্রুত হাঁটা মুস্তাহাব।

সাঈ করার উদ্দেশ্য সাফা পাহাড়ে উঠে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে নত ও বিনম্র হয়ে দু'হাত তুলে খুশূ'খুযুসহকারে আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের জন্য দীর্ঘ সময় দু'আ করা মুস্তাহাব। সাফা থেকে নেমে মারওয়া পাহাড়ে উঠেও অনুরূপ দু'আ করা মুস্তাহাব।

সা'ঈ করার সময় সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে নিম্নোক্ত দু'আ পড়া মুস্তাহাব।

দু'আটি হলো

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ اِنَّكَ اَنْتَ الاَعَزُّ وَالْاَكْرَم.

হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন ও দয়া করুন, নিশ্চয়ই আপনি পরম সম্মানিত ও মহৎ।

সা'ঈর সপ্তম চক্কর সমাপ্ত করে মাসজিদে হারামে এসে হাজরে আসওয়াদের সামনে, মাতাফে কিংবা মাসজিদে হারামের যে কোনো জায়গায় দু'রাক'আত সালাত আদায়

করবেন। এরপর চুল ছাটা বা মাথা মুন্ডন করা। এর মাধ্যমে ওমরা সমাপ্ত হয়ে যাবে।
রাসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সা'ঈ করার উদ্দেশ্য সাফার কাছাকাছি পৌছে পাঠ করলেন

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ

"নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন। তারপর বললেন আল্লাহ যেভাবে শুরু করেছেন আমিও সেভাবে শুরু করবো।
তারপর সাফা দিয়ে শুরু করলেন এবং সাফায় উঠে কিবলামুখী হয়ে তিনবার বললেন,
"আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আল্লাহ মহান। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।
তারপর বললেন:

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه، له الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وهُو عَلٰى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ، اَنْجَزَ وَعْدَهُ، ونَصَرَ عَبْدَهُ، وهَزَمَ الأَحْزَابَ وحْدَهُ

প্রশ্ন-৩ ঃ আমি বিশেষভাবে জানতে চাই ঈমান ইসলাম ও মুসলিমদের সবচাইতে বেশী ক্ষতিকর জিনিস কি, কেনো এবং কিভাবে?

আব্দুল্লাহ আন নু'মান
ধানমন্ডি, ঢাকা।

উত্তর ঃ ঈমান ও ইসলাম মুসলিমদের জন্য সবচাইতে বেশী ক্ষতিকর জিনিস কি? এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে প্রথমেই মনে আসে শিরক, কুফর ও হারামের কথা। আরো গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, এগুলো ঈমান, ইসলাম এবং মুসলমানিত্ব বিধ্বংসী কাজ এবং এগুলো অনেকটাই সু-স্পষ্ট। ফলে মুসলিমগণ এগুলোর ব্যাপারে কম-বেশী সচেতন ও সজাগ থাকে। কেউ যদি শয়তানের ধোকায় পড়ে কখনো এর কোনো একটা করে বসে, পরক্ষণেই যখন চেতনা ফিরে আসে তখনই তওবা করেও চোখের পানি ফেলে কান্নাকাটি করে। এতে আশা করা যায় যে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন সেই সাথে কিছু বোনাস ও দিয়ে দেন। এতে শয়তানের জ্বালা-যন্ত্রনা আরো বেড়ে যায়। ফলে শয়তান এমন এক পাপ আবিষ্কার করলো যেটা পাপের দিক থেকে খুবই গুরুতর হলেও মানুষ সেটাকে পাপ তো মনেই করবেনা বরং ইবাদত ও সাওয়াবের কাজ মনে করে শয়তানের প্রেরনা ও প্ররোচনায় পূর্ণ উদ্যেমে ও খালেস ভাবে তা অবিরাম করতে থাকবে। কেউ তো না করবেই না বরং সাওয়াবের কাজ মনে করে সমাজের সবাই তার সহযোগী হবে এবং তাকে উৎসাহ যোগাবে। ফলে সমাজের সর্বত্র সেটি ভালো একটি সাওয়াব ও নেকির কাজ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। আর শয়তানও মানুষের মনে এর গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করে দেয় ও বাড়িয়ে দিতে থাকে। একাজটি আর কিছু নয়, একাজটির নাম হলো বিদ'আত। সে বিদ'আতের পৃষ্ঠ পোশকতা দেয় এবং এটাকে মানুষের মনে আকর্ষণীয় ও চাকচিক্যময় করে তোলে। এ হলো মানব জাতির এবং আল্লাহর দীনের ও মুসলিম উম্মাহর চিরশত্রু এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের চরম দুশমন মারদূদ শয়তান (আলাইহিল লা'নাহ)।

এখন জানার বিষয় হলো, বিদ'আত কি এবং কাকে বলে?

بدعة (বিদ'আত) শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো নতুন সৃষ্টি, দৃষ্টান্ত বিহীন উদ্ভাবন। এক কথায় নতুন ও অভিনব। বিদ'আত অর্থ হলো যা ছিল না, পরে হয়েছে। বিদ'আতের সজ্ঞা এভাবে দেয়া হয়

مَااَحْدَثَ عَلَى غَيرِ ِمِثَالٍ سَابِقٍ .

অর্থাৎ যা পূর্ব দৃষ্টান্ত ছাড়া উদ্ভাবন করা হয়েছে। (ফাতওয়া ও মাসাইল: ১খ, পৃষ্ঠা ৪৮৬)

বিদ'আত সম্পর্কে আল্লামা শাতবী (র) লিখেছেন

اِنَّ الْبِدْعَةَ الْحَقِيْقَةَ الَّتِي لَمْ يَدُلُّ عَلَيْهَا دَلِيْلٌ شَرْعِيٌّ لَا مِنْ كِتَابٍ وَلَا مِنْ سُنَّةٍ وَلَا اِجْمَاعٍ وَلَا اِسْتِدْلَال مُعْتَبَرٍ عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ لَا فِي الْجُمْلَةِ ولَا فِي التَّفْصِيْلِ وِ لِذٰلِكَ سُمِّيَتْ بِدْعَةً لِاَنَّهَا مُخْتَرَعٌ عَلٰى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ .

প্রকৃত ও সত্যিকার অর্থে বিদ'আত হলো যার স্বপক্ষে ও সমর্থনে শরী'আতের কোনোই দলীল নেই। না আল্লাহর কিতাবে, না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ বা হাদীসে, না ইজমার কোনো দলীলে। না এমন কোনো দলীল পেশ করা যায় যা মুহাককিক উলামায়ে কেরামের নিকট গ্রহণযোগ্য, না মোটামুটি, না বিস্তারিত ও খুটিনাটিভাবে। এজন্যই এর নাম দেয়া হয়েছে বিদ'আত। কেননা তা মনগড়া, সকল্পিত, শরী'আতে তার কোনো পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই। (আল ই'তিসাম লিশ শতবী: ১খ, পৃ ৩৬৬)

প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ ইমাম খাত্তাবী (র) বিদ'আতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন,

كل شيئ احدث على غير اصل من اصول الدين وعلى غير عبارة وقياسة واما ما كان منها مبنيا على قواعد الاصول فليس ببدعة ولا ضلالة .

"যেসব মত বা নীতি দীনের মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয় বা শরী'আতে তার কোনো দৃষ্টান্ত নেই এবং যা কিয়াস দ্বারাও সমর্থিত নয় এমন যা কিছুই নতুনভাবে উদ্ভাবন করা হয় তা-ই বিদ'আত। অবশ্য যা দীনের মূলনীতি মোতাবিক এবং তারই ভিত্তিতে গঠিত তা বিদ'আত নয় এবং গোমরাহীহও নয়। (প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ৪৮৮) সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে এসেছে 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَن اَحْدَثَ فِي اَمْرِنَا هَذا مَا لَيْسَ مِنهُ فهو رَدٌّ .

যে ব্যক্তি আমাদের এই দীনের মধ্যে এমন কিছু নতুন উদ্ভাবন করে, যা এর মধ্যের নয় তা প্রত্যাখ্যাত।

উপরিউক্ত বিভিন্ন বর্ণনায় শব্দের কিছু তারতম্য ও ব্যবধান থাকলেও প্রকৃত পক্ষে ও বিচার-বিশ্লেষণ অভিন্ন। অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ, সাহাবায়ে কোরামের তরীকা ও ইজমা সূত্রে প্রমাণিত আকায়িদ ও মাসাইলই হচ্ছে

দীন ও শরী'আত এবং যা কিছু এর পারপন্থী তার বাহ্যরূপ ইবাদাতের মত হলেও তা প্রত্যাখ্যাত ও গর্হিত বিদ'আত।

বিদআতের কুফল

রাসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরীকা ও আদর্শ হচ্ছে সুন্নাহ এবং যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরীকা ও আদর্শ বহির্ভূত তা-ই হচ্ছে বিদ'আত।

সুখাইক ইবন হারিস আস সুমালী (রা) সূত্রে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

مَا أَحْدَثَ قَوْمٌ بِدْعَةً، إِلاَّ رُفِعَ مِثْلُهَا مِنَ السُّنَّةِ، فَتَمَسُّكٌ بِسُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ إِحْدَاثِ بِدْعَةٍ

"কোনো জাতি বা সম্প্রদায় যখন দীনের মধ্যে কোনো বিদ'আত চালু করে তখন ঐ পরিমাণ সুন্নাত দীন থেকে উঠে যায়। অতএব কোনো বিদ'আত চালু না করে সুন্নাত আঁকড়ে ধরে থাকার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত। (মুসনাদে আহমদ)

ইবনুল মাজেশুন (র) বলেন, আমি ইমাম মালেক (র) কে বলতে শুনেছি

من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن مُحَمَّد ﷺ خان الرسالة, لأن الله تعالى يقول (اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا)

"যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোনো বিদ'আত চালু করে এবং সে এটাকে সাওয়াবের কাজ মনে করে প্রকৃতপক্ষে সে এই বলে অভিযোগ আনলো যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার রিসালাতের দায়িত্ব পালনে খিয়ানত করেছেন (নাউযু বিল্লাহি মিন যালিকা) কেননা মহান আল্লাহ বলেন, আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি এবং আমার নি'আমাত তোমাদের প্রতি পূর্ণ করেছি। আর তোমাদের জন্য ইসলামকে তোমাদের দীন হিসেবে কবুল করে নিয়েছি। (৫ : সূরা আল মায়িদাহ, আয়াত-৩)

অতএব, সে দিন যেসব বিষয় দীন হিসেবে গণ্য ছিলনা আজও তা দীন হিসেবে বিবেচিত হবে না (ইখতিলাফুল উম্মাহ: ১খ, পৃ ৮৭-৯০) (ফাতওয়া ও মাসাইল: পৃ ৪৮৯)

কোনো শ্রেণির মানুষকে কিভাবে গোমরাহ ও বিপথগামী করতে হয় সেসব কৌশল শয়তানের খুব ভালো ভাবেই জানা আছে। সে ঐসব কৌশল অবলম্বন করেই কুরআন ও হাদীস বহির্ভূত কাজকে ধর্মের লেবাস পরিয়ে মানুষের সামনে পেশ করে, অত:পর সরল প্রান মানুষের শ্রমশক্তি, সময় ও অর্থ এসব বেহুদা কজে লাগিয়ে তাদের জীবন জিন্দেগী বরবাদ করে দেয়। ফলে তারা কুরআন হাদীসের সুস্পষ্ট প্রমাণাদি থেকে চোখ বন্ধ রেখে নব উদ্ভাবিত বিদ'আতকে বড় সাওয়াবের কাজ মনে করে আনন্দ চিত্তে তা করতে থাকে। এ কারণে তারা জীবনে তাওবার প্রয়োজনীয়তা কখনো অনুভব করেনা এবং তাওবাও তাদের নসীব হয়না।

প্রশ্ন-৪ ঃ কোনো ব্যাক্তি তার সুদের টাকা দিয়ে তার ঋণ পরিশোধ করতে পারবে কি?

ঐশী রহমান

রানী বাজার, রাজশাহী।

উত্তর ঃ না, পারবে না। কেননা ঋণ হলো তার নিজের হালাল দায় বা দেনা। এটা পরিশোধ করা তারই দায়িত্ব ও কর্তব্য। সুদের টাকা দিয়ে এ দেনা পরিশোধ করা হলে সুদের এ টাকাগুলো তারই ভোগ করা হয়। অথচ সুদের এটাকা ভোগ করা তার জন্য হারাম। অতএব, কেউ যদি সুদের টাকা দিয়ে নিজের ঋণ পরিশোধ করে তাহলে নিশ্চিতভাবে তার সুদ খাওয়া হলো। এটা তার জন্য সুস্পষ্ট হারাম। তাছাড়া সে এ টাকার মালিকও সে নয়। তার কর্তব্য হবে সুদের কোনো রকম সাওয়াবের নিয়ত ছাড়া নেহায়েত গরীব ও ক্ষুধার্থ লোকদেরকে দিয়ে দেয়া।

প্রশ্ন-৫ ঃ জিনেরা কি গায়েবের বিষয় জানে?

আশরাফুল আলম

চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর ঃ না, জিনেরা গায়েব জানে না এবং গায়েবের কোনো বিষয়ও তারা জানেনা।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ

বলুন, আসমান যমীনে আল্লাহ ব্যতীত কেউ গায়েবের খবর জানে না। (সূরা আন নামল - ৬৫)

শুধু জিনই নয়, আল্লাহ ব্যতীত সৃষ্টি জগতের কোনো সৃষ্টিই গায়েবের কোনো জ্ঞান রাখে না এবং গায়েব জানেনা।

প্রশ্ন-৬ ঃ জনৈক ব্যক্তির একটি প্রাইভেট গাড়ী আছে, সেটি তিনি ভাড়ায় খাটান। মাসে যে ভাড়া পান তাতে তার সংসার চলে, উদ্বৃত্ত থাকে না। গাড়ীর দাম লক্ষ টাকা। জানার বিষয় হলো এ গাড়ীর কি যাকাত দিতে হবে।

তানভীর হোসাইন

বরিশাল।

উত্তর ঃ না, এ গাড়ীর যাকাত দিতে হবেনা। তবে গাড়ী ভাড়া দিয়ে যে অর্থ উপার্জন করেন তা দিয়ে সংসার খরচ চালাবার পর যদি টাকা উদ্বৃত্ত থাকে এবং সে টাকা যদি নিসাব পরিমান হয় (অর্থাৎ, সাড়ে বায়ান্ন ভরি রূপার সমমূল্যের হয়) এবং সেই নিসাব পরিমান টাকা যদি পূর্ণ এক বছর পর্যন্ত জমা থাকে, তাহলে তার উপর যাকাত ফরয হবে। অন্যথায় নয়। অবশ্য গাড়ী ভাড়ার টাকা ছাড়া যদি তার অন্য কোনো খাতে টাকা থাকে কিংবা সোনা-রূপা থাকে তার মূল্য ধরে সব মিলে অর্থাৎ গাড়ী ভাড়ার উদ্বৃত্ত টাকা +অন্য টাকা + সোনা রূপার মূল্য + প্রয়োজনের অতিরিক্ত যদি কোন সম্পদ থাকে সব মিলে নিসাব পরিমান হলে তার উপর যাকাত ফরয হবে।